ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

৪৫ তম বর্ষ ■ ২য় সংখ্যা ■ বিষ্ণু ৫৩৫ ■ এপ্রিল ২০২১

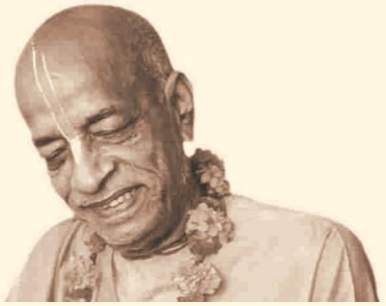

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

আধুনিক সমাজের কোন মস্তিষ্ক নেই

এই সমাজে প্রত্যেককে মস্তিষ্ক বা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর নির্দেশে পরিচালিত হওয়া উচিত। সেইহেতু মস্তিষ্ককে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত। সেইটি আমাদের বক্তব্য।

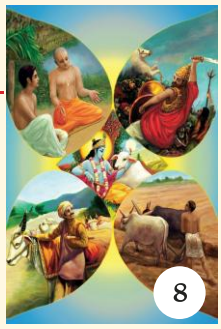

৪

৬ আচার্য বাণী

বৈদিক শাস্ত্রের আলোকে জন্মান্তরবাদ

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এই দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু স্বরূপত আমরা কি এই দেহ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারছি যে, আমরা দেহ নই; দেহের ভেতর যে আছে, সে-ই হচ্ছে আমি; আমি হচ্ছি দেহী। —দেহস্থিত সচেতন সত্তা।

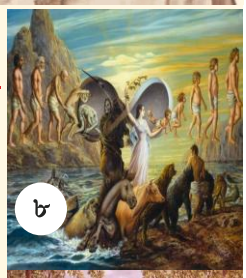

৮

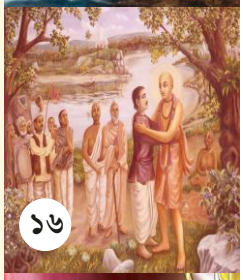

১৬

১০ সামায়িক প্রসঙ্গ

সীতাকে গৌরবান্বিত করতে রাম সকল যন্ত্রণা ভোগ করেন

নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, অজ্ঞ এবং ধূর্ত মানুষেরা যারা যে কোন গুণকে অপবাদ দেওয়ার জন্য নীচে নামতে পারে তারা এমনকি সীতার পবিত্রতা বিষয়েও প্রশ্ন করার সাহস করতে পারে। সর্ব অবস্থায়, সর্ব পরিস্থিতিতে পত্নীকে রক্ষা করাই পতির সর্বপ্রথম কর্ম।

১৪ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পরন্তপ অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতিবাহিত হয়েছে। আমি সেই সমস্ত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু তুমি পার না। বিভূচৈতন্য ভগবানের সঙ্গে অণুচৈতন্য জীবের এটি পার্থক্য।

১৭ পরিচয়

ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে জীবনের সার-সর্বস্ব, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তাই আমাদের অবশ্যই শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করতে হবে।

২৬

২২ শাস্ত্র কথা

ব্রহ্মসংহিতা

যে পরমপুরুষ স্বাংশকলাদি নিয়মে রামাদি মূর্তিতে স্থিত হয়ে জগতে নানা অবতার প্রকাশ করেছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হয়েছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

২৩ সংস্কৃতি

মূর্তিপূজা বনাম বিগ্রহসেবা

লোহার মধ্যে আগুন প্রবেশ করলে লোহাও অগ্নিময় হয়ে উঠে। ঠিক তেমনি বিগ্রহ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা চিন্ময় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ভক্তি সহকারে যখন ভগবানকে আহবান করা হয়, ভগবান তখন সেই বিগ্রহের মধ্যে আবির্ভূত হন।

২৫ প্রচ্ছদ কাহিনী

শ্রীরামের বনগমন

মোহ রাত্রিতে সবাই ঘুমিয়ে নানারকম স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু যোগীরা সেই মোহ রাত্রিতে জেগে থাকেন পরমার্থ চিন্তাতে। তাঁরা মায়ামোহময় জগত সম্বন্ধে উদাসীন।

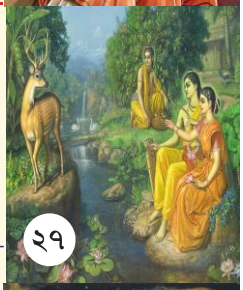

২৭

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

কারও প্রশংসা করা কিংবা কারও নিন্দা করা উচিত নয় কেন?

১৩ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

বাদশাহী পোলাও

১৯ ইসকন সমাচার

শ্রীমায়াপুরে বসন্ত পঞ্চমী উৎসব

২৮ ছোটদের আসর

ভাঙ্গা খাটের বৈরাগ্য

৩০ ভক্তি কবিতা

বিন্ধ্যাবলীর ভগবৎ বন্দনা

৩০

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি **শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ** আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সনাতনগোপাল দাস ● **ডিটিপি** তাপস বেরা ● **প্রচ্ছদ** জহর দাস ● **হিসাব রক্ষক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত

অফিস অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা ৭০০০১৯,
মোবাইল ৯০৭৩৭৯১২৩৭
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০২০ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সম্পাদকীয়

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হলে আমরা কি লাভ করি ?

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র চিরদিন তাঁর বিমাতা কৈকেয়ীকে ঘৃণা করতে পারতেন এবং কেউ তাঁকে দোষ দিত না। কৈকেয়ী এত মূর্খ ছিলেন যে তার স্বামী দশরথের চোখের জলও তার হৃদয় বিগলিত করতে পারেনি। তিনি তাকে দেহত্যাগ করতে দেখেও পরিবর্তিত হন নি। তিনি শুধু নিজের মিথ্যা অহঙ্কারকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তার অনুভব, তার আবেগ, তার অভিলাষ, তার সন্তুষ্টি তার কাছে এই পৃথিবীর যেকোন কিছুর থেকেই বড় ছিল। তিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও সীতামাকে অবশেষে বনবাস করতে পাঠিয়ে ছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে দশরথ অবশেষে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি অযোধ্যায় সকল বেদনার একমাত্র কারণ ছিলেন।

কিন্তু তার দুষ্ট ব্যবহার সত্ত্বেও ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাকে ভালোবাসতেন। নিজের ঘৃণ্য ব্যবহার উপলব্ধি করার পর তিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে যেতে ভীত এবং লজ্জিত হয়েছিলেন। অশ্রুপূর্ণ চক্ষে তিনি তাঁর নিকটে গেলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাকে আলিঙ্গন করলেন। তার কৃতকর্মের জন্য তিনি কখনো তাকে অভিযুক্ত করেন নি। তিনি তাঁর নিকট মার্জনা ভিক্ষারও পূর্বে তিনি তাকে ক্ষমা করেন।

এই হলো আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবানের গুণ। তিনি সুমহান। তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না। তিনি সবার শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ।

আমরা, জীবাত্মারা তাঁকে অপছন্দ করতে পারি। আমরা তাঁকে অমান্য করতে পারি। আমরা তাঁকে অবজ্ঞাও করতে পারি। কিন্তু তথাপি তিনি কখনোও আমাদের ত্যাগ করেন না। আমরা যেখানেই থাকি, তিনি আমাদের সাথে থাকেন। পরমাত্মারূপে তিনি সর্বদা আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন।

কঠোপনিষদ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ব্যাখ্যা করে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুটি বন্ধু পাখীর ন্যায় একটি বৃক্ষে উপবিষ্ট থাকে। একটি পাখী জীবাত্মা এবং অপরটি পরমাত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মা হতে পৃথকভাবে, স্বাধীনভাবে উপভোগ করতে চায়। পরমেশ্বর ভগবান (পরমাত্মা) যিনি আত্মার স্রষ্টা তিনি আত্মাকে এই জড়জগত উপভোগ করার অনুমতি প্রদান করেন।

আত্মা জড়জগতকে উপভোগ করার প্রয়াসে ভগবানের থেকে দূরে সরে গিয়ে অপরিমেয় যন্ত্রণা পায়। অবহেলিত হওয়া সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবান জীবাত্মাদের কখনও ত্যাগ করেন না। ভগবান নিদারুণভাবে চান আমরা যেন তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করি। তিনি উদ্বিগ্নভাবে সেই ক্ষণটির জন্য প্রতীক্ষা করেন কখন আমরা তাঁর দিকে ফিরে তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসার অনুভূতি ব্যক্ত করবো। যে মূহূর্তে আমরা তা করি, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি আমাদের সব ভুল মার্জনা করে আমাদের সকল দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করেন। আমাদের জীবন আনন্দসাগরে পরিণত হয়।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ জীবন হতে নির্বাসিত করার কারণে কৈকেয়ী যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন। তিনি ভেবে ছিলেন তিনি ভগবান ব্যতীত ভগবানের রাজ্য উপভোগ করতে পারবেন। আমরাও পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের জীবন হতে নির্বাসিত করার কারণেই এই জগতে সংগ্রাম করি এবং যন্ত্রণাবিদ্ধ হই। আমরা এই জগত উপভোগ করতে চেয়ে বারংবার অকৃতকার্য হই। প্রায় সবসময়ই আমরা ভয় ও উদ্বেগের মধ্যে বাস করি। আমাদের হৃদয় অসন্তুষ্ট রয়ে যায়।

কৈকেয়ী তাঁর ভুল বুঝতে পেরে নিজের লাভের জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে নিজের জীবনে পুনরায় স্বাগত জানান। অনুরূপভাবে আমাদেরও নিজেদের ভুল উপলব্ধি করে এই জগত উপভোগের বাসনা ত্যাগ করতে হবে। এক মূহূর্ত নষ্ট না করে আমাদের সকলের সুহৃদ এবং শুভাকাঙ্ক্ষী (সুহৃদম্ সর্ব-ভূতানাম্, গীতা ৫.২৯) পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আমাদের ফেরা উচিত।

যে মূহূর্তে আমরা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হয়ে তাঁকে আমাদের হৃদয় সিংহাসনে উপবেশন করাই, আমাদের সকল দুঃখের অবসান হবে। আমরা আর উদ্বিগ্ন হব না এবং ভবিষ্যতের জন্য ভীত হব না। আমাদের হৃদয় অসীম চিন্ময় আনন্দে পূর্ণ হবে।

প্রতিষ্ঠাতার বাণী

১৯৭৪ সালে জেনেভায় মি. সি হেনিস এবং কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ. সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন হয়েছিল।

আধুনিক সমাজের কোন মস্তিষ্ক নেই

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

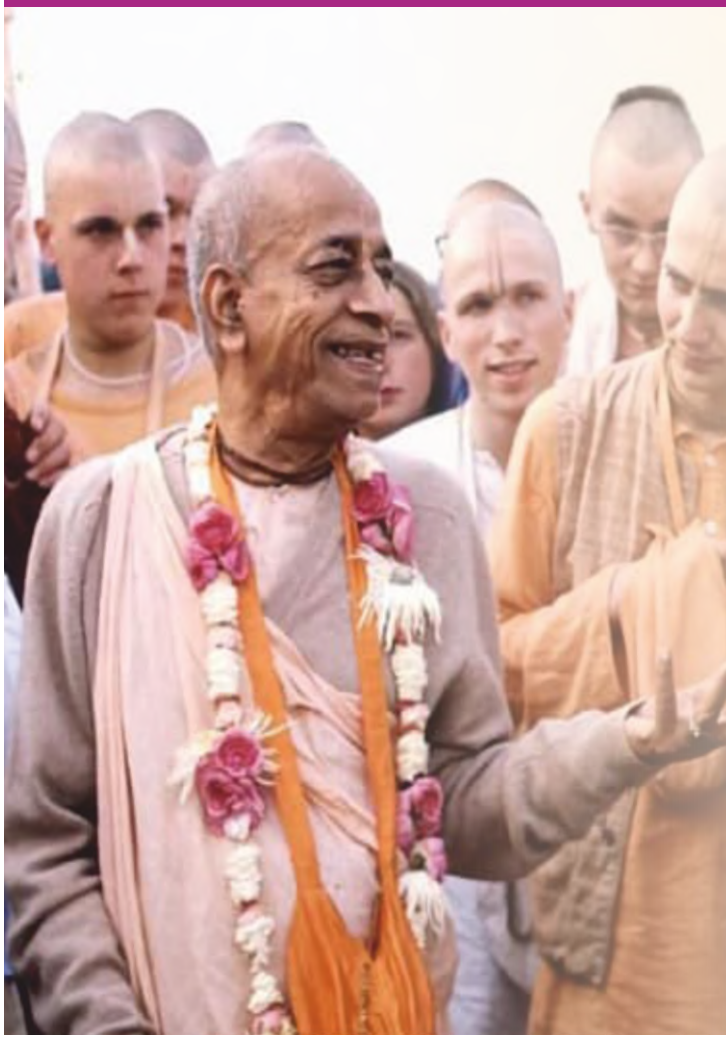

মি. হেনিস ঃ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং সামাজিক ন্যায় উন্নয়নের জন্য আগ্রহী।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনায় সামাজিক দেহের চারটি ভাগ আছে—মস্তিষ্ক, পথপ্রদর্শনের জন্য; বাহু, সুরক্ষা প্রদানের জন্য; উদর, পুষ্টিসাধনের জন্য; পদ, সহায়তার জন্য। এদের প্রত্যেকেই সামাজিক দেহ রক্ষা করে এবং সমগ্র দেহ এদের সবার জন্য কাজ করে। কিন্তু যদি আপনি নিরপেক্ষভাবে ভাবেন, মস্তিষ্ক হলো প্রথম ভাগ, বাহু দ্বিতীয়, উদর তৃতীয় এবং পদ চতুর্থ।

আপনার দেহকে সুস্থ রাখার জন্য আপনি এর বিভিন্ন ভাগের যত্ন নেন। কিন্তু যদি আপনি মস্তিষ্কের যত্ন না নিয়ে শুধুমাত্র আপনার পায়ের যত্ন নেন তাহলে আপনার একটি ভাল স্বাস্থ্যবান দেহ হবে না। জাতিসংঘ সমাজের চতুর্থ ভাগ, শ্রমিকের যত্ন নিচ্ছে। তারা প্রথম ভাগের কি যত্ন নিচ্ছে? সেটাই আমার প্রশ্ন। এই মুহূর্তে সমাজে প্রথম শ্রেণীর মানুষের, বুদ্ধিজীবী মানুষের অতি অল্প যত্ন নেওয়া হচ্ছে।

মি. হেনিস ঃ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের একটি প্রধান বিভাগের উদ্দেশ্য হলো সামাজিক ন্যায় স্থাপন এবং তার অর্থ হলো যে প্রতিটি শ্রমজীবী শ্রেণীর সমাজে একটি যথাযথ স্থান

রয়েছে ... আমরা সামাজিক ন্যায়ে, শ্রমিকদের প্রতি ব্যবহারে, শ্রমিকদের সুরক্ষায় এবং নিরাপত্তায়, কাজের সুরক্ষায়, স্বাস্থ্যে এবং শ্রমিকের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু, একই সঙ্গে পেশাদার কর্মী যেমন—স্থপতি, নার্স, ডাক্তার, পশুচিকিৎসাবিদ ইত্যাদির মধ্যে একটি সমতা আনার চেষ্টা করছি।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সমাজের বৈদিক ধারণা অনুসারে উচ্চতর তিন শ্রেণী বুদ্ধিজীবী, রক্ষণশীল এবং উৎপাদক শ্রেণী—কখনোই বেতনের জন্য চাকুরীদাতার কাছে আবদ্ধ নয়, তারা স্বাধীন। চতুর্থ শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী চাকুরীরত।

আমার বক্তব্য হলো যে জাতিসংঘের এখন চিন্তা করা উচিত, কিভাবে সমগ্র মানব সমাজ খেয়ালখুশী মতো নয়, একটি প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে পারে। যেখানেই যাই, আমি সেখানকার কোন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করি, 'জীবনের উদ্দেশ্য কি?' তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেন না, তার অর্থ সেখানে প্রকৃতপক্ষে কোন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নেই। কেউ জানে না জীবনের প্রকৃত, আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য। আত্মোপলব্ধি এবং ভগবৎ উপলব্ধি কারোর নেই।

মি. হেনিস ঃ আচ্ছা, আমি ভাবছি যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অসাম্য হ্রাস করে সবাইকে জীবনের ভালো বস্তুগুলির আরও বেশী অংশ দিয়ে আরও আনন্দদানের সূচনা করার জন্য ব্রতী—যেমন তারা উপলব্ধি করে, যেমন মানুষ বুঝতে পারে। এমন হতে পারে যে তারা এটি ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকায়

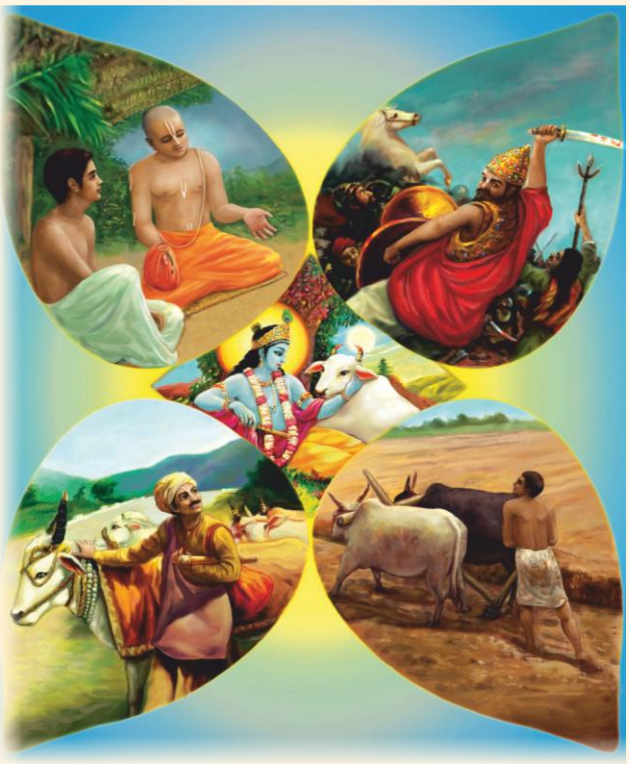

শ্রমিক শ্রেণী উচ্চবেতনভোগী। কিন্তু যেহেতু সেখানে কোন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক নেই—কোন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নেই—শ্রমিক শ্রেণী ভাবছে, 'আমার কাছে এখন টাকা আছে—আমি কিভাবে এটি ব্যবহার করব?' এবং প্রায়ই তারা মদ্যপানে তাদের অর্থের অপব্যবহার করে। আপনি ভাবতে পারেন যে আপনি শ্রমিক শ্রেণীকে ভালোভাবে জীবনযাপনের আশ্বাস দিচ্ছেন, কিন্তু তাদের পথপ্রদর্শকরূপে কোন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নেই—সামাজিক দেহের মস্তিষ্ক নেই—তারা অর্থের অপব্যবহার করবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।

> এই সমাজে প্রত্যেককে মস্তিষ্ক বা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর নির্দেশে পরিচালিত হওয়া উচিত। সেইহেতু মস্তিষ্ককে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত। সেইটি আমাদের বিষয়।

মি. হেনিস ঃ আচ্ছা, আমরা অন্যভাবে একে দেখার চেষ্টা করি। যেমন আমি বলছি, আমরা মানুষকে বলি না কিভাবে তারা তাদের অর্থের ব্যবহার করবে। আমরা তাদেরকে বলি না অবসর সময়ে তারা কি করবে। আমরা চেষ্টা করি যে তারা অবসরের যথেষ্ট সুবিধা পায়, যাতে

তাদের যথার্থ সুযোগ, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল ইত্যাদি থাকে যদিও এটি আমাদের প্রাথমিক বিষয় নয়। কিন্তু আমরা যা করার চেষ্টা করি আপনি এতে উৎসাহিত হবেন—শ্রমিকদের শিক্ষা বিষয়েও আমরা অনেক বড় পরিকল্পনা করেছি। আমাদের প্রচেষ্টা রয়েছে শ্রমিকদের শিক্ষা দেওয়া, তাকে আধুনিক শিল্পের অসুবিধা, ব্যবস্থাপনার অসুবিধা সম্পর্কে বোঝানো, টেবিলের অপর প্রান্তে যারা দর কষাকষি করছে তাদের বোঝা; ব্যালান্স শীট পড়তে শেখা, উদাহরণ স্বরূপ একটি ফার্মে শ্রমিকদের নিয়ে ম্যানেজমেন্ট কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হয়; অর্থনীতি, ফিনান্স ইত্যাদি বিষয়ক মূলসূত্র সম্বন্ধে উপলব্ধি।

এখন যদি একজন মদ্যপান করতে চায়, সে চাইবে। কিন্তু আমরা অনুভব করি ... আমরা মদ্যপান বিষয়ে আগ্রহী নই যতক্ষণ না পর্যন্ত তা কাজে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। সেক্ষেত্রে সেই লোকটির নিজের কাজের পক্ষে বিপদ হতে পারে। সেখানে, অবশ্যই আমরা এ বিষয়ে আগ্রহী।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, সেটি আমাদের বক্তব্য নয়। আমাদের বক্তব্য হলো এই সমাজে প্রত্যেককে মস্তিষ্ক বা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর নির্দেশে পরিচালিত হওয়া উচিত। সেইহেতু মস্তিষ্ককে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত। সেইটি আমাদের বক্তব্য।

মি. হেনিস ঃ আচ্ছা, আমি বলবো, যে পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে একজনের পদমর্যাদার উন্নতিতে, কাজে তার কুশলতা বৃদ্ধিতে এবং শ্রমিক সংগঠনে তার সহকর্মীদের প্রতিনিধিত্বের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইত্যাদি বিষয়ে কোন প্রভাব ফেলছে সে পর্যন্ত আমরা সচেতন। আমরা তার সার্বিক সাংস্কৃতিক উন্নতি, শিক্ষা, বিশেষভাবে শ্রমিকরূপে শিল্প এবং শ্রমিক সংগঠন সম্পর্কিত বিষয়ে তার শিক্ষার বিষয়ে খেয়াল রাখি। আমরা আশা করি এইভাবে মানুষ তার স্থিতির উন্নতি করতে পারে, এবং তার স্থিতির উন্নতি দ্বারা সে মদ্যপান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে ভাবতে পারবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আমরা চাই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের জন্য, শ্রমিকের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে উপলব্ধি করা এবং সন্তুষ্ট করা। এমন নয় যে শ্রমিকরা শুধুই গাধার মতো কঠোর পরিশ্রমী হয়, বুদ্ধিবৃত্তি নেই, জীবনের উদ্দেশ্য নেই। সব পশুর মধ্যে গাধারা সবথেকে কঠিন পরিশ্রমী—কিন্তু সে তবুও এক পশু, কারণ—সে জানে না সে কেন কাজ করছে। আপনি দেখছেন? কোনো বুদ্ধি নেই। আমরা তা চাই না। আমরা চাই এক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী যারা পথ প্রদর্শন করবে, যাতে শ্রমিকরা বুদ্ধিদীপ্তভাবে কাজ করতে পারে এবং ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে। আমাদের আর আপনাদের মধ্যে সেইটিই পার্থক্য।

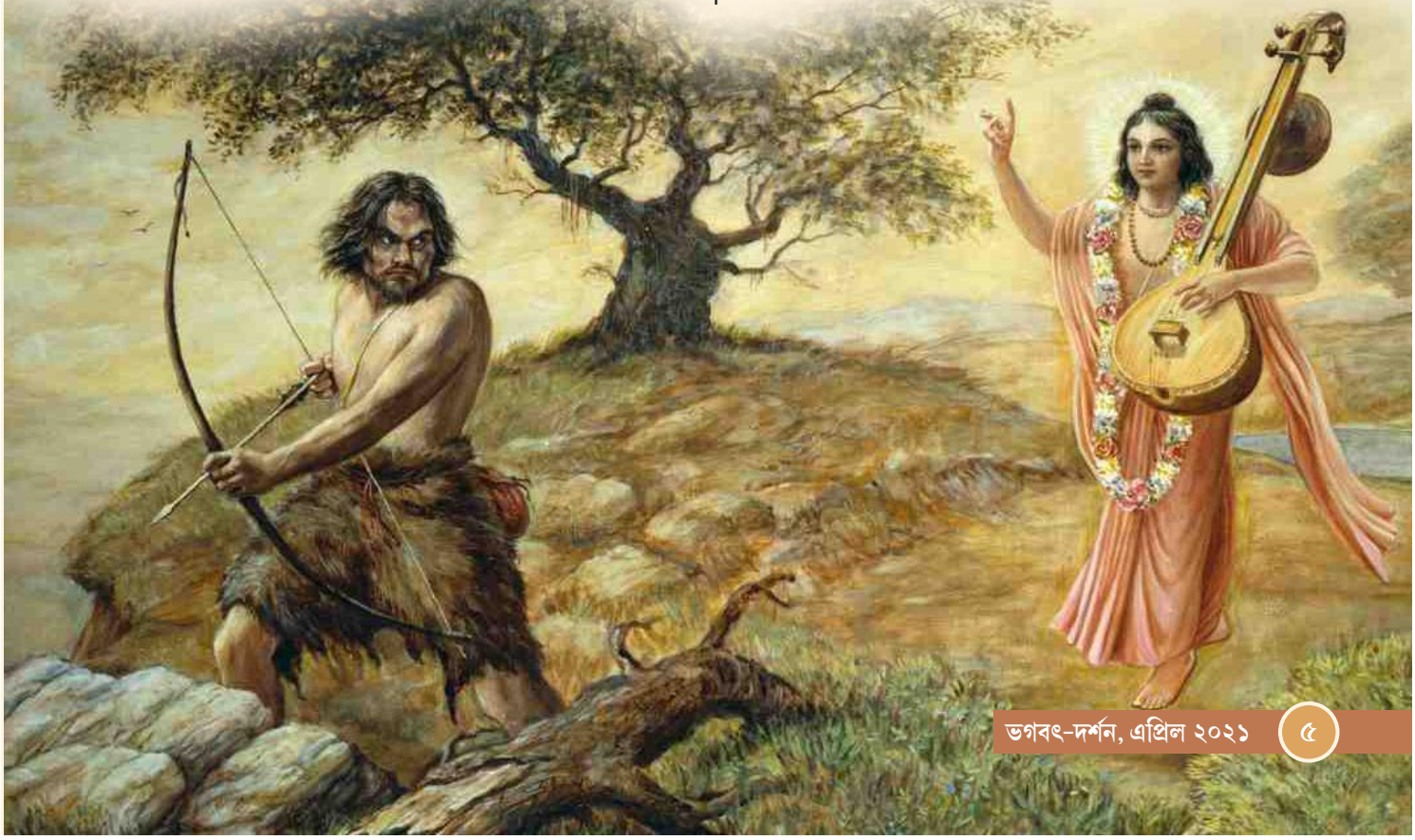

বৈদিক শাস্ত্রের আলোকে জন্মান্তরবাদ

শ্রীমদ্ সুভগ স্বামী মহারাজ

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ একদিন ভারতের কোন এক রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর কাছ থেকে সন্তোষজনক উত্তর তিনি পাননি।

তখন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে ভগবদ্গীতার কথা বলেছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, তা বিশ্লেষণ করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, পাঁচ হাজার বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, 'দেহ' এবং 'দেহী'—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এবং সম্পর্ক উপলব্ধির শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

গীতায় (২/১৩) বলা হয়েছে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।।

'দেহ' ও 'দেহী'—দুটি কথা আছে এখানে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এই দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু স্বরূপত আমরা কি এই দেহ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারছি যে, আমরা দেহ নই; দেহের ভেতর যে আছে, সে-ই হচ্ছে আমি; আমি হচ্ছি দেহী।—দেহস্থিত সচেতন সত্তা।

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথমে আমার একটি শিশুর দেহ ছিল। সেই দেহটি এখন নেই, তা ধ্বংস হয়ে গেছে। তারপর আমার বালকের দেহ ছিল; তারপর আমি এক কিশোরের দেহ পেয়েছিলাম; সেই দেহটিরও বিনাশ হয়েছে। কিন্তু তখনও আমি ছিলাম, তারপর আমি যুবক-দেহ পেলাম।

বর্তমান যুগের চিকিৎসা-বিজ্ঞানও স্বীকার করে নিয়েছে যে, প্রতি মুহূর্তে আমাদের দেহের কোষগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা নতুন দেহ পাচ্ছি। প্রতি সাত বছর পর, আমাদের দেহের আমূল পরিবর্তন ঘটছে; তখন আমি এক সম্পূর্ণ নতুন দেহ লাভ করছি।

কানাডায় *'মন্ট্রিয়েল গেজেট'* নামে একটি পত্রিকায় 'আত্মা সম্পর্কে হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞের জিজ্ঞাসা' এই শিরোনামায় একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল কিছুদিন আগে। এই নিবন্ধে বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার উইলফ্রেড জি বিগোলো সুশৃঙ্খলভাবে আত্মার স্বরূপ ও তার উৎস সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্য অনুরোধ করেছেন বিজ্ঞানীদের কাছে।

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁকে এই বিষয়ে একখানি চিঠি লেখেন এবং আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে বৈদিক শাস্ত্রের অভ্রান্ত প্রমাণ দিয়েছিলেন। কার্যকর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই চিৎকণ আত্মাকে জানা যায়। এই চেতন কণাটি আমাদের দেহকে জীবন দান করে, এবং বস্তুত এই চিৎকণের অস্তিত্বের জন্যই আবার আমরা অন্য দেহে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারি। এই সব তথ্য তিনি বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর ঐ চিঠিতে।

ডঃ বিগোলো (টরেন্টো) ছিলেন জেনারেল হাসপাতালের হৃদ্‌রোগের শল্য চিকিৎসা বিভাগের প্রধান। তিনি তাঁর বহু অভিজ্ঞতা থেকে জানাচ্ছেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে রোগী এক জীবন্ত অবস্থা থেকে প্রাণহীন, নির্জীব অবস্থায় যাওয়ার সময়ে রোগীর মধ্যে এক রহস্যময় পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। সেই দৃশ্যটির বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ দেওয়া খুব কঠিন। সব চেয়ে লক্ষ্যণীয় এই যে, ঐ অবস্থায় রোগীর চোখে ঔজ্জ্বল্যের অভাব দেখা যায়।

তার চোখের মধ্যে এক প্রাণহীনতার ভাব ফুটে ওঠে এই সমস্ত লক্ষণ বিচার করে, দীর্ঘ ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে, 'আত্মা' বলে কিছু একটা বিস্ময়কর সত্তা অবশ্যই জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করে।

বহুকাল থেকেই পৃথিবীর বহু বিখ্যাত দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিকরা এই সচেতন সত্তার বা আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁদের বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেছেন। যেমন, গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস ভবিষ্যৎ জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেছেন। দেহের বিনাশের পর চেতন সত্তা, আত্মা বিরাজিত থাকে বলে, তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

তখনকার দিনে গ্রীসদেশে তাঁর দার্শনিক মতবাদ জনমানসে, বিশেষত যুবসমাজে, বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। প্রাচীনপন্থী সমাজনেতাদের চক্রান্তে দেশের রাষ্ট্রশক্তি তাঁকে বন্দী করে রাখে। বন্দী অবস্থায় কারাগারের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবার জন্য তাঁকে বিষপান করতে দেওয়া হয়েছিল। বিষপান করবার আগে আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী সেই মহান্ দার্শনিক সক্রেটিস সেই সমস্ত মূঢ় মূর্খ বিষদাতাদের বলেছিলেন, ''আগে আমি কে—তাকে ধরবার চেষ্টা কর।'

কিন্তু ঐ মূর্খরা তাঁর কথার গূঢ় অর্থ কিছুই বুঝতে পারেনি। তিনি তাঁর নিজের আত্মার কথা বলছিলেন। তিনি তো 'দেহ' নন, তিনি একটি চেতন সত্তা, একটি চিৎকণ জীবাত্মা—এই সব তত্ত্ব ঐ মূর্খ লোকগুলি জানত না। তাই দার্শনিক সক্রেটিসকে তারা বুঝতে না পেরে পাগল মনে করেছিল।

কেবলমাত্র সক্রেটিসই নন, টলস্টয়, হারমন হেস, এমারসন আদি বিশ্বের অনেক দার্শনিক, কবি, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকও আত্মা ও তার কার্যাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। আর বিশ্বের সব চেয়ে প্রাচীন জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রসম্ভার বৈদিক গ্রন্থাবলীতে বলা হয়েছে, *অহম্ ব্রহ্মাস্মি*—অর্থাৎ আমি জড় দেহ নই, আমি ব্রহ্ম, আমি এক চেতন সত্তা—আত্মা। বিশ্বের অন্যান্য বহু শাস্ত্রেও আমাদের এই দেহস্থিত চেতন সত্তা অর্থাৎ আত্মার কথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বৈদিক শাস্ত্রে আত্মার অস্তিত্বের বিবরণ সব চেয়ে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে।

> বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এই দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু স্বরূপত আমরা কি এই দেহ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারছি যে, আমরা দেহ নই; দেহের ভেতর যে আছে, সে-ই হচ্ছে আমি; আমি হচ্ছি দেহী।—দেহস্থিত সচেতন সত্তা।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতে আত্মতত্ত্ব চর্চা চলে আসছে, তাই ব্রহ্মসূত্র থেকে শুরু হয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। সেখানে বলা হয়েছে, *'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।'* জড়জাগতিক বিচারে একজন পণ্ডিত হলেও, শ্রীসনাতন গোস্বামী, যিনি তাঁর পূর্ব আশ্রমে বাংলার নবাবের মন্ত্রী ছিলেন, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অকপটে প্রশ্ন করেছিলেন, ''কে আমি?'' এইটি যথার্থ

বুদ্ধিমানের প্রশ্ন এবং এই প্রশ্ন থেকে যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভের মাধ্যমে জীবনের প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের সম্ভাবনা জাগে।

এই আত্মার বিষয়ে গীতায় (২/২৯) একে আশ্চর্যজনক বলে বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।।

তেমনি, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই আত্মা সম্পর্কে অর্জুনকে বুঝিয়েছেন, *দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ম্*, অর্থাৎ এই দেহে বসবাসকারী যে দেহী, তা নিত্য বিরাজ করে এবং তা একেবারেই অবধ্য। অন্যত্রও বৈদিক শাস্ত্রে আত্মার এই অবিনশ্বরতার কথা বলা হয়েছে। আত্মাকে পরম জ্ঞানময় এবং আনন্দপূর্ণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গীতায় এই দেহটিকে একটি যন্ত্র বলা হয়েছে। জীব এই যন্ত্রে আরোহণ করে *(যন্ত্রারূঢ়াণি)* বহুকাল যাবৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ৮৪ লক্ষ বিভিন্ন ধরনের জীবদেহ ধারণ করে ভ্রমণ করে চলেছে। ৯ লক্ষ জলজ যোনি, ১১ লক্ষ ক্রিমি যোনি, ১০ লক্ষ পক্ষী যোনি, ২০ লক্ষ বৃক্ষ যোনি, ৩০ লক্ষ পশু যোনি এবং ৪ লক্ষ মনুষ্য যোনি আছে।

এই সমস্ত বিস্তারিত তথ্য বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে রয়েছে, যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের বিশদভাবে শেখানো উচিত।

ভগবদ্গীতায় জীবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'সর্বগত' বলেছেন; তাই সে ব্রহ্মলোক থেকে পাতাল লোক পর্যন্ত বিভিন্ন জীবদেহ লাভ করে জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যুগ যুগ ধরে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান ব্যাসদেব বলেছেন, *লব্ধ্বা সুদুর্লভং ইদং বহু সম্ভবান্তে*—বহু বহু জন্মের পর জীব অত্যন্ত দুর্লভ এই মনুষ্যজন্ম, মানবদেহ লাভ করে। মানবদেহ অনিশ্চিত *(অধ্রুবম্)*, কিন্তু সেই সঙ্গে *অর্থদম্*। এই মানবদেহ ধারণের মাধ্যমেই জীবনের যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। তাই এই দেহের মূল্য অপরিসীম। কেননা, এই জীবনেই মানুষ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হতে পারে। উপযুক্ত সদ্গুরু তথা শুদ্ধ বৈষ্ণবের কাছ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে মানুষ পরমতত্ত্ব লাভ করতে পারে এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

জীবজগতের বৈচিত্র্যের বিশেষ ব্যাখ্যা আমরা একমাত্র বৈদিক শাস্ত্রে সুন্দরভাবে আছে, দেখতে পাই। *কর্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপদ্যতে*—প্রত্যেক মানুষের সকল কর্মই দেবতারা লক্ষ্য করে থাকেন। তাঁরা মানুষের সকল কর্মের ফলাফল বিচার করেন এবং মানুষের কর্ম আর তার আসক্তি অনুসারে প্রকৃতি তাদের বিভিন্ন দেহ প্রদান করেন। প্রকৃতি এমন একটি দেহ দেয়, যার দ্বারা মানুষ তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে পারে এবং তার যথাযথ কর্মফলও ভোগ করবার সুযোগ লাভ করে। মনুষ্যেতর জীবকুল নিম্নযোনি থেকে উত্তরোত্তর উচ্চযোনি লাভ করে থাকে। কারণ, মানুষের মতো তাদের চেতনা উচ্চ স্তরের নয়, তাই তাদের কর্মফল নেই।

এই সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই থাকা বাঞ্ছনীয়। তা না হলে দেশের মানুষ কর্মফলের পরিণাম সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হতে আগ্রহী হবে না।

প্রশ্ন১। কারও প্রশংসা করা কিংবা কারও নিন্দা করা উচিত নয় কেন?

—সুজিত হালদার, হুগলী

উত্তর ঃ প্রতিটি দিন মানুষ কারও না কারও প্রশংসা কিংবা নিন্দা করে চলে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন, *পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ*। অন্যের বদ্ধ স্বভাব ও কার্যকলাপের প্রশংসা কিংবা উপহাস কোনটিই করা উচিত নয়।

পর স্বভাবকর্মানি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যাতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ।।

'যে কেউ অন্যের গুণ ও ব্যবহারের প্রশংসা অথবা নিন্দা করবে, মায়াময় দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার ফলে সে অবশ্যই খুব শীঘ্র নিজের পরম স্বার্থ থেকে বিচ্যুত হবে।' (ভাগবত ১১/২৮/২)

কারও সম্বন্ধে ভালো বলা হলো তার প্রশংসা করা এবং মন্দ বলাই হলো তার নিন্দা করা।

প্রথমত, একই ব্যক্তি আপনার কাছে প্রশংসনীয় হলেও অন্যদের কাছে নিন্দনীয় হতে পারে। আবার, কোনও ব্যক্তি আপনার কাছে নিন্দনীয় হলেও অন্যদের কাছে প্রশংসনীয় হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ বিচার নিছক ব্যক্তি সাপেক্ষ ব্যাপার।

দ্বিতীয়ত, একই ব্যক্তি অতীতে নিন্দনীয় ছিল, এখন নয়। কিংবা অতীতে প্রশংসনীয় ছিল, এখন নয়। আপনার সাথে যে ব্যক্তি আজ মন্দ আচরণ করছে, আগামীকাল সে আপনার প্রিয় কার্যও করতে পারে। আজ যে ব্যক্তি ভালো আচরণ করছে, আগামীকাল সে আপনার অপ্রিয় কার্য করতে পারে। নিন্দা বা প্রশংসা এভাবে সাময়িক পরিস্থিতির বিচারে রদ-বদলও হতে পারে।

তৃতীয়ত, মুক্ত জীবের ভালোমন্দ বিচার করে কোনও লাভ নেই। কারণ ভালোমন্দ বদ্ধ জীবের গুণ। আবার, বদ্ধজীবের ভালো মন্দ বিচার করেও লাভ নেই। কারণ বদ্ধজীব স্বভাবতই দোষপ্রবণ।

চতুর্থত, যারা ভালো হতে চায়, তারা সর্বদা কর্মব্যস্ত থাকে। তাদের কারও ভালো-মন্দ বিচার করতে সময় নেই। আবার, যারা মন্দভাগী, তারা সর্বদা অন্যের নিন্দা করতে সময় দিয়ে থাকে। তারা অন্যের কোনও ভালো বুঝতে পারে না।

পঞ্চমত, ত্রিগুণময়ী মায়ার সংসারে মায়িক গুণের প্রাবল্য এবং একে অন্যের উপর আধিপত্য করার ভাব থাকায় হেয়তা অনুপাদেয়তা প্রবেশ করেছে। নিন্দা বা প্রশংসা জড় জাগতিক ব্যাপার। চিন্ময় জগতে এইসব নিন্দা প্রভৃতি হেয় ভাব নেই। সত্ত্ব, রজো, তমো এই ত্রিগুণ থেকেও সেখানে কোনও ক্রিয়া সম্পাদিত হয় না।

ষষ্ঠত, জড় বিশ্বের সমস্ত কর্ম নিত্য নয়। প্রায় সব কর্মই অজ্ঞতা-মিশ্র ও আনন্দ বাধা যুক্ত। আত্মার কল্যানার্থে সমস্ত কর্মই প্রতিকূল বা অনুপযুক্ত। সেক্ষেত্রে সেই সমস্ত কর্মের প্রশংসা বা নিন্দা কোনও কাজের নয়।

সপ্তমত, জড় বদ্ধ জীবের প্রশংসা করা বা নিন্দা করা বৃথা। কারণ, নিন্দা বা প্রশংসা কাউকে তার জড়বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বাজারে দুটি ছাগল বাঁধা। একটি ছাগল কচি কচি ঘাস খাচ্ছে, অপরটি শুকনো পাতা খাচ্ছে। আপনি তা দেখে যদি বলেন, প্রথম ছাগলটি কত বুদ্ধিমান, সে সুন্দর করে ভালো ঘাস খাচ্ছে। আর, দ্বিতীয় ছাগলটি

শুকনো পাতা চিবোচ্ছে। সেক্ষেত্রে আপনার নিন্দা-প্রশংসাসূচক কোনও কথার মূল্য নেই, কারণ দুই ছাগলই কাটা পড়বে। অনুরূপভাবে জড় বিষয়ী লোকের আচরণ ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন, জড় বদ্ধাবস্থায় পতিত থাকবে।

অষ্টমত, কারও নিন্দা বা প্রশংসা করতে গিয়ে নিজের বাক্য বিচলিত হতে পারে। সাধু নিন্দা কিংবা অসাধু প্রশংসাও হতে পারে। ফল স্বরূপ অপরাধ ঘটে এবং ভক্তি অনুশীলনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

নবমত, বাংলায় একটি কথা প্রচলিত, 'নিজ চরকায় তেল দাও'। অর্থাৎ পরের চরকাতে তেল আছে কি নেই, সেসব দেখার দরকার নেই। নিজের চরকা ঠিকমতো চালু রাখতে আগে তেল আছে কিনা দেখে নিতে হবে। পর চর্চায় মন না দিয়ে নিজ কর্তব্যে সময় উপযোগ করুন। যেক্ষেত্রে লোকে কয়েক মিনিট হরিনাম জপতেও সময় করতে পারে না, সে আবার এর তার কথা বলে সময় নষ্ট করছে কোন্ মুখে?

প্রশ্নোত্তরে ঃ **সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী**

সীতাকে গৌরবান্বিত করতে রাম সকল যন্ত্রণা ভোগ করেন

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

রামদাস গভীর যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁর চক্ষুদ্বয় দুঃখের অশ্রুতে পরিপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান রামচন্দ্র এবং জগন্মাতা সীতার স্মরণে এমন নিমগ্ন ছিলেন যেন তিনিও তাঁদের সাথে বনবাস করছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তিনি যে তার ক্ষুদ্র গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজনে আমন্ত্রণ করেছেন তাও তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের আয়োজিত বিশাল ভোজসভার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পরিবর্তে তিনি বিনা আমন্ত্রণে বিদুরের গৃহে গমন করেন এবং পালং শাকের সাধারণ পদ গ্রহণ করেন।

সেই ভগবান আজ মধ্যাহ্নভোজনে ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত। কিন্তু রামদাস তখনও রন্ধন করেননি। মহাপ্রভু ক্ষুধার্ত কিন্তু রাগান্বিত নন। পরমেশ্বর ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন 'কেন আপনি রন্ধন করেননি?'

''রন্ধন সামগ্রী এখনও এসে পৌছয়নি। লক্ষ্মণ সবজি, ফল মূল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করতে বনের ভিতর গমন করেছেন, কিন্তু এখনও প্রত্যাবর্তন করেননি। তিনি এলেই সীতামাতা রন্ধন শুরু করবেন।'' লীলায় রামদাসের এই গভীর নিমগ্ন অবস্থা মহাপ্রভুর হৃদয় জয় করল। শীঘ্রই ব্রাহ্মণ তার ভুল বুঝতে পারলেন। মহাপ্রভু তার গৃহে তার আমন্ত্রণে এসেছেন। ইতিমধ্যেই মধ্যাহ্ন হয়ে গেছে। আর বিলম্ব না করে তিনি রন্ধন আরম্ভ করলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভোজন পরিবেশন করলেন। চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ৯।১৮৫ কথিত আছে ''শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তিনটের সময় মধ্যাহ্নভোজন গ্রহণ করেন।''

কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছু গ্রহণ করলেন না। তিনি উপবাসী রইলেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, ''কেন আপনি উপবাস করছেন? কেন আপনি অসুখী?''

''সীতামাতাকে রাবণ নামক এক ঘৃণ্য ব্যক্তি স্পর্শ করেছিল এই চিন্তায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত বোধ করি। আমার হৃদয় নিদারুণ বিতৃষ্ণায় দগ্ধীভূত হয়। আমার মরে যাওয়া উচিত কিন্তু আমি এমন দুর্ভাগা যে, আমি এখনও জীবিত।'' ব্রাহ্মণ রামদাস অশ্রুপূর্ণ চক্ষে এই কথাগুলি বললেন।

ব্রাহ্মণের ব্যথাপূর্ণ বাক্য শ্রবণে মহাপ্রভু অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন। তিনি অবিলম্বে উত্তর দিলেন, ''সীতামাতার দেহ চিন্ময়, জড় নয়। সুতরাং কিভাবে একজন জড়জীব তাঁকে স্পর্শ করবে। স্পর্শ তো দূরের কথা, জড়চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে দর্শন পর্যন্ত করতে পারে না। রাবণ সীতামাতাকে হরণ করেনি। মায়াচ্ছন্ন রাক্ষস তাঁর মায়া আকৃতিকে অপহরণ করেছে।'' মহাপ্রভুর এই গাম্ভীর্যপূর্ণ উক্তি তাঁকে যন্ত্রণামুক্ত করল এবং বিলম্ব সত্ত্বেও রামদাস যেন মধ্যাহ্নভোজন করেন তা মহাপ্রভু নিশ্চিত করলেন।

ভগবান রাম এবং সীতামাতার কাহিনী সমগ্র বিশ্বে বিশেষতঃ ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক এই সম্বন্ধে অবহিত নন যে, রাবণ সীতামাতাকে অপহরণ করেননি, তিনি সীতা সদৃশ মায়া আকৃতিকে অপহরণ করেছিলেন।

কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা প্রশ্ন করে, যদি তাই হয় তবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কেন সীতামাতাকে তার পবিত্রতার প্রমাণ দিতে বলেন? তিনি বিশাল সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন সীতার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। রাবণকে বধ করতে নয়। কিভাবে তিনি তাকে অবিশ্বাস করতে পারেন? সীতাদেবী রোদন করছিলেন। লক্ষ্মণ বিধ্বস্ত কিন্তু অসহায়। জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশে তিনি কাষ্ঠ সংগ্রহ করে অগ্নি প্রজ্বলন করলেন।

সীতামাতা জগদীশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে অগ্নিতে প্রবেশ করলেন।

সাগর স্তব্ধ। আকাশ অবিশ্বাসপূর্ণ দৃষ্টিপাত করছে। স্থলচর, জলচর ও খেচর প্রাণীগণ, মহাদেব এবং ব্রহ্মার নেতৃত্বে দেবতাগণও সেই অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে চাইছেন। শ্রীরামচন্দ্র মাথা নত করে রয়েছেন। তিনি চান না তাঁর অশ্রু কেউ দর্শন করে। অগ্নিতে সোনা যেমন অধিক উজ্জ্বল প্রতিভাত হয়, অনুরূপভাবে অগ্নিতে সীতামাতা এমন জ্যোতির্ময়ী রূপে প্রকাশিত হলেন যে, তাঁর জ্যোতি সূর্যের জ্যোতির্ময় রশ্মিচ্ছটাকেও ম্লান করে দিল।

সেই অগ্নি থেকে অগ্নিদেবের উদ্ভব হলো, সীতামাতার শ্রীচরণপদ্মের স্পর্শে তিনি নিজেকে অপার আশীর্বাদধন্যরূপে উপলব্ধি করলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন, ''তাঁর সামান্য উপস্থিতি মাত্রে

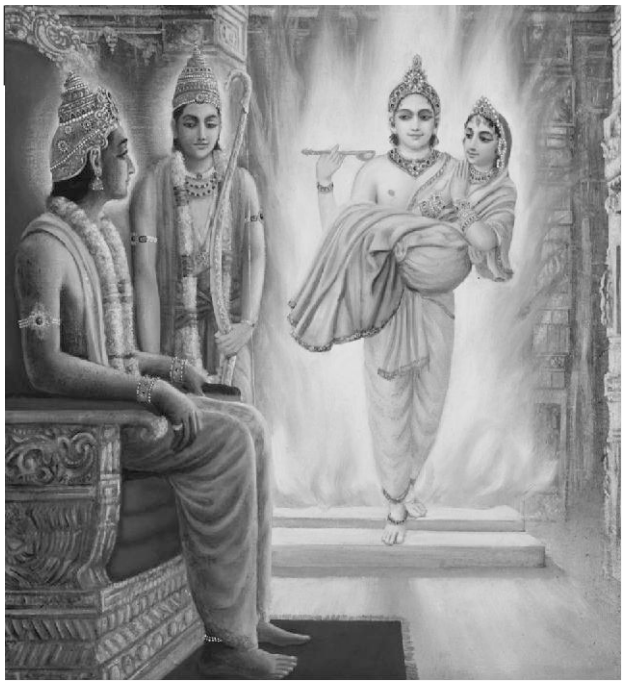

ত্রিভুবন পবিত্র হয়। কিভাবে পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে? তিনি পরম পবিত্র।''

রক্তিম বস্ত্র পরিহিতা দিব্য পুষ্পমাল্য এবং সুন্দর আভূষণে সুসজ্জিতা সীতামাতা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অগ্রসর হলেন। তিনি তাঁর সাথে মিলনের জন্য অধীর ছিলেন। তিনি আর আবেগ রোধ করতে পারলেন

নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, অজ্ঞ এবং ধূর্ত মানুষেরা যারা যে কোন গুণকে অপবাদ দেওয়ার জন্য নীচে নামতে পারে তারা এমনকি সীতার পবিত্রতা বিষয়েও প্রশ্ন করার সাহস করতে পারে। সর্ব অবস্থায়, সর্ব পরিস্থিতিতে পত্নীকে রক্ষা করাই পতির সর্বপ্রথম কর্ম।

না। শ্রীরামচন্দ্র দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন, ''সূর্য হতে সূর্যরশ্মি যেমন অবিচ্ছিন্ন তেমনই সীতাও আমা হতে অবিচ্ছিন্ন।''

সীতার পবিত্রতা জানার জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কারোর শংসাপত্রের প্রয়োজন নেই। কিন্তু তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করে সবার হৃদয়ের কথা জানেন। তিনি জানেন বিবেকহীন মানুষ সীতামাতাকে প্রশ্ন করে তাদের অবনমন ডেকে আনবে। প্রাণাধিক প্রিয় সীতার অপবাদ তিনি কিভাবে সহ্য করবেন। তিনি ভালোই জানেন যে, তাঁর এই কর্ম অজ্ঞদের দ্বারা সমালোচিত হবে। তিনি এও জানেন যে; এই কর্ম সীতার

গৌরব নিশ্চিত করবে। নিত্যকাল দিকে দিকে তাঁর গুণকীর্তন হবে।

তিনি জানতেন নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, অজ্ঞ এবং ধূর্ত মানুষেরা যারা যে কোন গুণকে অপবাদ দেওয়ার জন্য নীচে নামতে পারে তারা এমনকি সীতার পবিত্রতা বিষয়েও প্রশ্ন করার সাহস করতে পারে। সর্ব অবস্থায়, সর্ব পরিস্থিতিতে পত্নীকে রক্ষা করাই পতির সর্বপ্রথম কর্ম।

তিনি সর্বোত্তম, তিনি তাঁর নিত্যসঙ্গী সীতাকে রক্ষা করে সর্ব গৌরবে গৌরবান্বিত করার জন্য সকল যন্ত্রণা গ্রহণ করেছেন।

পিতা দশরথ অপেক্ষা কে শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়কে উত্তমরূপে উপলব্ধি করবেন। সীতামাতার শ্বশুর মহাশয় দশরথ সেই সময় ইন্দ্রের সাথে স্বর্গে বাস করছিলেন। তিনি দিব্য রথে নেমে এসে বললেন, ''তোমার প্রিয় পতিকে ভুল ভেব না। তোমাকে এক মুহূর্তের কষ্টে পতিত করে সমগ্র বিশ্বকে ঘোষণা করে জানাতে চাইছেন যে, তুমি পরম পবিত্র। নিত্যকাল তোমার গৌরবগাথা গীত হবে। তোমার গুণ সকল গুণবতী স্ত্রীদেরও ম্লান করবে।''

কলিযুগে পুনরায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হয়ে সীতা হরণ কখনও হয়নি এবং তাঁর পবিত্রতা কখনও পরীক্ষিত হয়নি এই

ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

রামদাসের সঙ্গে মিলনের পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামেশ্বর মন্দির পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি কূর্ম পুরাণ প্রাপ্ত হন। এই পুরাণে কথিত আছে যে, রাবণ যে মুহূর্তে সীতাকে হরণ করতে এসেছিলেন, সীতা তখনি অগ্নিদেবকে আহ্বান করেন। অগ্নিদেব ছায়া সীতাকে আনয়ন করেন এবং রাবণ সেই মিথ্যা সীতাকে হরণ করেন। প্রকৃত সীতা অগ্নিদেবের নিবাসে গমন করেন। সেইজন্য যখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে পরীক্ষা করেন তখন মিথ্যা সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করেন। সেই মুহূর্তে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে অগ্নিদেব প্রকৃত সীতাকে আনয়ন করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবিলম্বে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দাস রামদাসের নিকট গিয়ে তাকে এই পাণ্ডুলিপি প্রদান করেন। কূর্মপুরাণের প্রকৃত পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হয়ে রামদাস অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাঁর সকল

বাদশাহী পোলাও

উপকরণ ঃ বাসমতী চাল ৫০০ গ্রাম। চিনি ১০০ গ্রাম। এলাচ ১০টি। লবঙ্গ ১০টি। তেজপাতা ৫টি। কমলালেবুর রস ২ কাপ। কাজু-কিসমিস-পেস্তা আন্দাজ মতো। খোয়া ১০০ গ্রাম। ঘি ১০০ গ্রাম। ফ্রেস ক্রিম ১টি। নিকুতী ছোটো ৩০০ গ্রাম। গোলাপ জল ১ টেবিল-চামচ। লবণ সামান্য।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ একটি হাঁড়িতে পরিমাণ মতো জল দিয়ে উনানে বসিয়ে গরম করুন। জল টগ্‌বগ করে ফুটে উঠলেই বাসমতী চাল ধুয়ে হাঁড়িতে দিয়ে দিন। ভাত বেশ শক্ত থাকতে থাকতে হাঁড়ি নামিয়ে ভাতের জল ঝরিয়ে দিন।

এবার একটা ডেকচিতে ১ কাপ জল দিয়ে উনানে বসান। তাতে চিনি, এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা দিন। জল ফুটতে শুরু হলে জলঝরানো ভাত তাতে ঢেলে দিন। খোয়া, কমলালেবুর রস, লবণ দিন। চামচ দিয়ে ভাতটা নাড়তে থাকুন। সব মিশে গেলে ফ্রেস ক্রিম ও কাজু-কিসমিস-পেস্তা গুলো দিয়ে নাড়িয়ে দিন। ঘি ঢেলে দিন। ভালো করে মিশিয়ে দিন।

এবার এই পোলাও নামিয়ে নিন। পোলাওর ওপরে নিকুতী দিয়ে সাজিয়ে শ্রীশ্রীগৌরনিতাইকে ভোগ নিবেদন করুন।

—রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

অর্জুনের চতুর্থ প্রশ্ন ৪।৪ নং শ্লোক

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্থ প্রশ্ন করেছিলেন চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ নং শ্লোকে—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি।।

অর্জুন বললেন—সূর্যদেব বিবস্বানের জন্ম হয়েছিল তোমার অনেক পূর্বে। তুমি যে আদিকালে তাঁকে এই জ্ঞান উপদেশ করেছিলে, তা আমি কেমন করে বুঝব?

অর্জুন কেন এই ধরনের প্রশ্ন করলেন আগে আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করব। তৃতীয় অধ্যায় কর্মযোগে ভগবান যখন কর্ম নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখন শেষের দিকে ৩/৩৬ নং শ্লোকে অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।

অর্জুন বললেন—হে বার্ষ্ণেয়, মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হয়েই পাপারণে প্রবৃত্ত হয়? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললেন, 'হে অর্জুন! রজোগুণের প্রভাবে কামই মানুষকে পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই মানুষকে ক্রোধে পরিণত করে তোলে'। তাই কামকে জীবের প্রধান শত্রু বলে জানবে। যদিও এই কাম দুর্বারিত অগ্নির মতো চির অতৃপ্ত তবুও এই কামকে জয় করবার একটা সহজ উপায় আছে। তা হলো চিৎ শক্তির দ্বারা বা জ্ঞান শক্তির দ্বারা কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে জয় করা যায় (গীতা ৩/৪৩ নং শ্লোক) তাই ভগবান কর্মযোগের পর জ্ঞানযোগের কথা বলতে শুরু করলেন।

ভগবান বলতে শুরু করলেন, মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলন করা এবং ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হওয়া। তাই সকল গ্রহলোকের এবং সকল রাষ্ট্রের শাসকবর্গের কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যমে, সংস্কৃতির

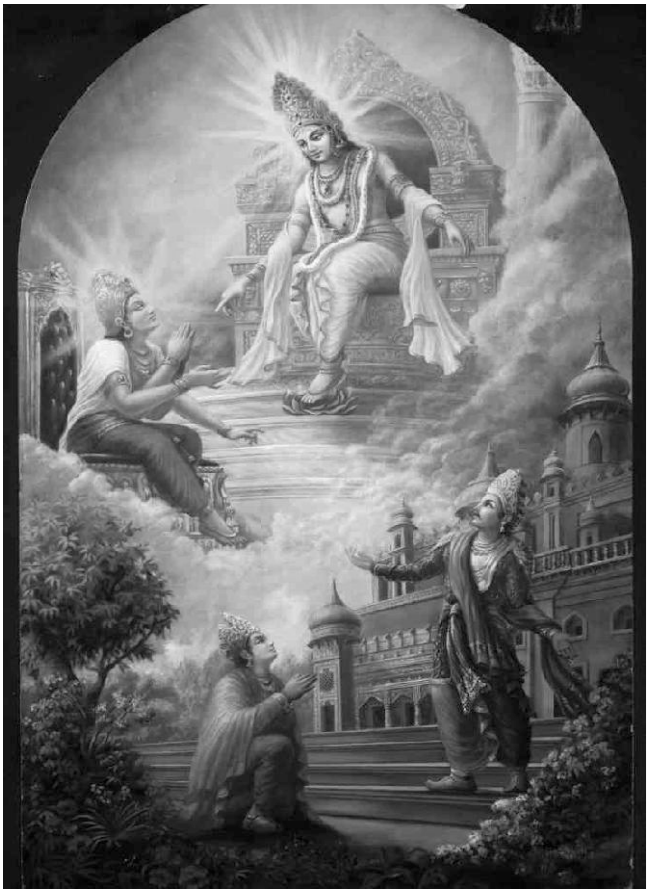

মাধ্যমে ও ভক্তির মাধ্যমে জনগণকে এই জ্ঞান বিতরণ করা। আমি এই জ্ঞান প্রথমে সূর্যদেব বিবস্বানকে দিই ১২ কোটি ৪ লক্ষ বৎসর পূর্বে এবং সেই জ্ঞান পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে সেই পরম্পরা ছিন্ন হয়েছে বলে পুনরায় আবার আমি তোমায় এই জ্ঞান প্রদান করছি।

আমাদের জানা উচিত পরম্পরা সাধারণতঃ তিন প্রকার—ক) রাজর্ষি পরম্পরা, খ) পঞ্চরাত্রিক পরম্পরা, গ) ভাগবত পরম্পরা। ভগবদ্গীতায় ভগবান যে পরম্পরার কথা বলেছেন তা হলো রাজর্ষি পরম্পরা। ভগবান স্বয়ং সূর্যদেব বিবস্বানকে দিয়েছিলেন। সেই

জ্ঞানই কালক্রমে পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল তাই পুনরায় ভগবান বদ্ধজীবের কল্যাণার্থে অর্জুনের মাধ্যমে জগৎবাসীকে দান করেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মানুষের প্রতি ভগবানের এক বিশেষ দান। রাজর্ষি মানে—রাজা + ঋষি। যিনি রাজা হয়েও বেদ মন্ত্রের তত্ত্ব ভালভাবে জানেন তাঁকে রাজর্ষি বলা হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ৪।২ নং শ্লোকের তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন গীতা বিশেষতঃ রাজর্ষিদের জন্যই উদ্দিষ্ট হয়েছিল, কারণ প্রজা পালনের জন্য তাঁদের এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কার্যকরী করতে হতো। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং লক্ষ্য করেন যে, গুরু শিষ্য পরম্পরার ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—তাই তিনি পুনরায় এই জ্ঞান অর্জুনকে প্রদান করলেন আমাদের মতো বদ্ধজীবকে কৃপা করার জন্য।

খ) পঞ্চরাত্রিক পরম্পরা—যেটি মন্ত্র দীক্ষার মাধ্যমে নেমে আসে। এই পরম্পরায় একটা অসুবিধা হলো গুরু পরম্পরা থাকতে থাকতে কোন গুরুদেব যদি সদাচারী না হন তা হলে শিষ্য যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারে না। ফলে সেই শিষ্য গুরু হলে তার শিষ্য যথার্থ শিক্ষা পেল না, ফলে পরে অসুবিধা হবে।

গ) ভাগবত পরম্পরা —যেটি বেদ বা ভাগবতের জ্ঞান যথাযথ প্রদান করার মাধ্যমে নেমে আসে। যেমন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিলেন ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা দিলেন নারদমুনিকে, নারদমুনি দিলেন ব্যাসদেবকে, ব্যাসদেব দিলেন মধ্বাচার্যকে—এই ভাবে পরম্পরা ধারায় ক্রমান্বয়ে নেমে এসেছে। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন শ্রীল মধ্বাচার্য ১০৪০ শকাব্দে জন্ম, আর ব্যাসদেব পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে জন্ম,—জ্ঞান প্রদান কিভাবে করলেন? এর উত্তর হচ্ছে এই পৃথিবীতে এখনও কয়েকজন বেঁচে আছেন— (১) ব্যাসদেব (২) হনুমান (৩) অশ্বত্থামা (৪) বিভীষণ (৫) পরশুরাম (৬) কৃপাচার্য ও (৭) বলি মহারাজ। ব্যাসদেব যখন বদরিকা আশ্রমে অবস্থান করছিলেন সেই সময় মধ্বাচার্য ঘুরতে ঘুরতে সেখানে উপস্থিত হন। সেই সময় ব্যাসদেব মধ্বাচার্যের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সমস্ত বেদ, বেদান্ত সূত্র, মহাভারত ও ভাগবতাদি শাস্ত্রের জ্ঞান দান করেছিলেন। তাই আমাদের সম্প্রদায়ের নাম ব্রহ্ম-মধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায়। আমাদের পরম্পরার নাম ভাগবত পরম্পরা।

ভগবান বললেন, হে অর্জুন, এই জ্ঞান আমি সকলকে দিই না, আর দিলেও তারা বুঝতে পারবে না।

তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু ও ভক্ত বলে এই জ্ঞান দিলাম। তখন অর্জুনের মনে প্রশ্নের উদয় হলো 'সূর্যদেব বিবস্বানের জন্ম হয়েছিল তোমার অনেক পূর্বে। তুমি যে পুরাকালে এই জ্ঞান উপদেশ করেছিলে, তা আমি কেমন করে বুঝব?' ভগবান এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সুন্দর ভাবে তুলে ধরলেন জীবের সঙ্গে তাঁর কি পার্থক্য। ভগবান বললেন—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।(৪/৫)

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পরন্তপ অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতিবাহিত হয়েছে। আমি সেই সমস্ত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু তুমি পার না। বিভুচৈতন্য ভগবানের সঙ্গে অণুচৈতন্য জীবের এটি পার্থক্য। শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন। যদিও অর্জুনকে এক মহাশক্তিশালী বীর বা পরন্তপ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যিনি শত্রুদমনে সমর্থ ছিলেন, কিন্তু পূর্বজন্মের কথা মনে রাখতে সমর্থ ছিলেন না। তাই জড় জাগতিক ক্ষমতার মাপকাঠিতে জীব যতই মহৎ হোক না কেন, সে কখনই ভগবানের সমতুল্য হতে পারে না। জড় জগতের সংস্পর্শে এলেও ভগবান কখনো আত্মবিস্মৃত হন না। এমন কি লক্ষ লক্ষ বছর আগে তাঁর প্রকটিত সমস্ত লীলাই তিনি মনে করতে পারেন। কারণ ভগবানের সচ্চিদানন্দময় দেহ পরিবর্তন হয় না, তাই তিনি কিছুই ভোলেন না। কিন্তু জীবের দেহান্তর হবার ফলে তার পূর্ণ বিস্মরণ ঘটে। ভগবান এও বললেন—আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে কার্য সাধন করে চলে যাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটি গানে তিনি বলেছেন, 'নিজ কর্ম গুণ দোষে যে যে জন্ম পাই।' তাই আমরা কোথায় জন্মগ্রহণ করবো—এবং কোথায় মৃত্যু হবে এবং কে কে আমার পিতা-মাতা হবে তা জানি না। কিন্তু ভগবান যেহেতু তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে এই জগতে আসেন তাই ভগবান নিজ কার্য সাধনের জন্য কোন্ দেহ ধারণ করবেন এবং কোথায় ও কোন্ পিতা-মাতা গ্রহণ করবেন তিনি আগে থেকেই জানেন। এটাই জীবের সঙ্গে ভগবানের পার্থক্য।

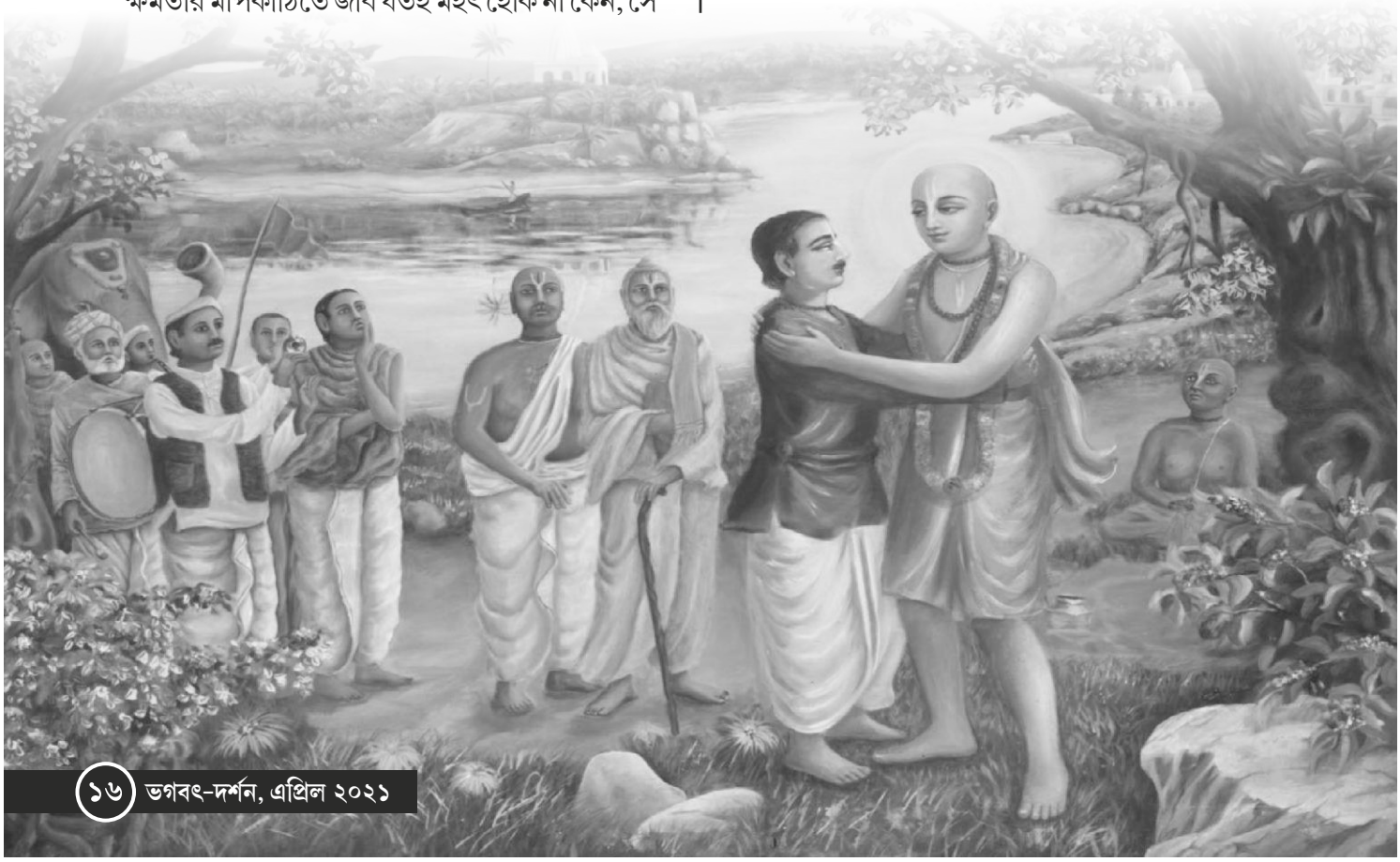

ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ

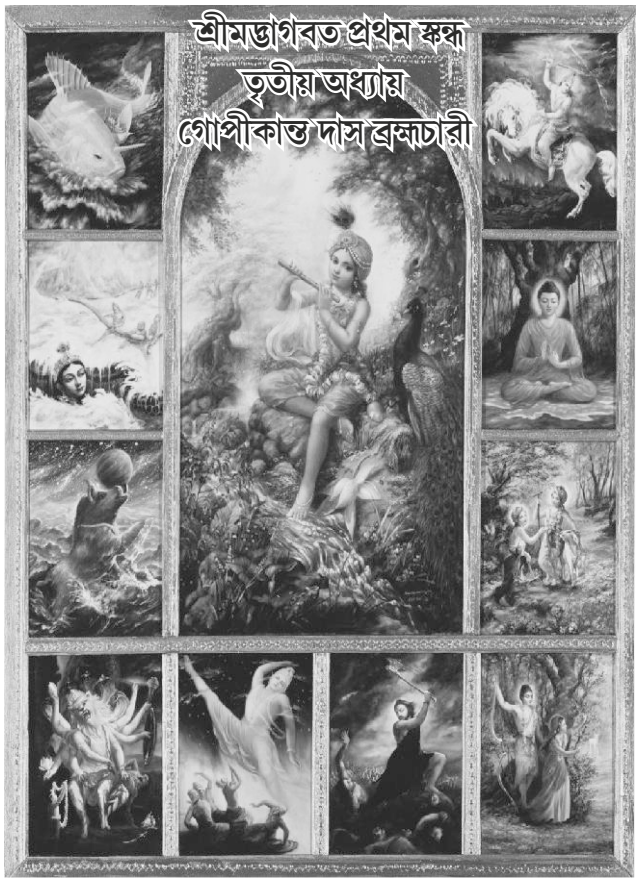

অধ্যায়ের কথাসার ঃ

শ্লোক ১–৫

সূত গোস্বামী সম্পূর্ণ জড় জগত সৃষ্টি এবং এক একটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতে তিন পুরুষাবতারের ভূমিকা বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৬–২৭

সূত গোস্বামী বাইশটি ভগবৎ অবতারের কথা বর্ণনা করলেন যাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হন, কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে ভগবানের অসংখ্য অবতার আছে।

শ্লোক ২৮–২৯

যদিও অসংখ্য ভগবৎ অবতার রয়েছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন তাঁদের উৎস এবং পরমেশ্বর ভগবান। মানুষের উচিত মনোযোগ সহকারে ভগবানের রহস্যপূর্ণ প্রকট অর্থাৎ অবতরণের কথা সকাল ও সন্ধ্যায় ভক্তি পূর্বক পাঠ করা।

শ্লোক ৩০–৩৯

ভগবানের (বিরাটরূপ) এবং জীবের জড় রূপ (স্থূল ও সূক্ষ্ম) হলো প্রকৃতপক্ষে কাল্পনিক। তাই, বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবানের অবতারের গুণ ও মহিমা কীর্তন করেন, যার ফলে বদ্ধজীব অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হয় এবং ভগবৎ প্রেম লাভ করেন।

শ্লোক ৪০–৪৪

শ্রীমদ্ভাগবতকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে সূত গোস্বামী গুণকীর্তন করেছেন, যা এই কলিযুগের মানুষদের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন কিভাবে এই শ্রীমদ্ভাগবতম্ শ্রীব্যাসদেব থেকে শুকদেব গোস্বামী পর্যন্ত পৌঁছায়।

প্রথম পুরুষাবতার হচ্ছে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু। তাঁর রোমকূপ থেকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডগুলির প্রতিটির ভিতর তিনি আবার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি সরোবর থেকে একটি পদ্ম প্রকাশিত হয়, সেটি হচ্ছে সমস্ত জীব এবং ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপ পরিচালনকারী প্রজাপতিদের আদি পিতা ব্রহ্মার আবির্ভাব স্থান। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রকাশ হয়, যিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা। তাঁকে বলা হয় হরি এবং তাঁর থেকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অবতারদের প্রকাশ হয়।

২২টি অবতার ঃ

১) ব্রহ্মার ৪জন পুত্র ব্রহ্ম-উপলব্ধি পন্থা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁরা ব্রহ্মচারী রূপে কঠোর তপশ্চর্যা পালন করেছিলেন।

২) পৃথিবীকে রসাতল থেকে উদ্ধারের জন্য বরাহ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

৩) দেবর্ষি নারদ শক্ত্যাবেশ অবতারে আবির্ভূত হয়ে ভগবদ্ভক্তি এবং নিষ্কাম কর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন।

৪) ধর্মরাজের পত্নীর গর্ভে নর ও নারায়ণ রূপে আবির্ভূত হয়ে ইন্দ্রিয় সংযমের আদর্শ প্রদর্শন করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

৫) শ্রীকপিল নামে অবতরণ করে সাংখ্য দর্শন প্রদান করেন।

৬) মহর্ষি অত্রির পুত্র ভগবান দত্তাত্রেয়। মাতা অনসূয়ার প্রার্থনায় তিনি তাঁর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অলর্ক, প্রহ্লাদ এবং অন্য অনেককে পারমার্থিক জ্ঞান দান করেছিলেন।

৭) প্রজাপতি রুচি ও তাঁর পত্নী আকূতির পুত্র যজ্ঞ। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড পালন করেছিলেন।

৮) মহারাজ নাভি ও তাঁর পত্নী মেরুদেবীর পুত্র মহারাজ ঋষভদেব। তিনি পূর্ণ সিদ্ধি লাভের পন্থা প্রদর্শন করেছিলেন।

৯) পৃথুরূপে রাজদেহ ধারণ করে পৃথিবীর ওষধী সমূহকে তিনি দোহন করেছিলেন।

১০) চাক্ষুষ মন্বন্তরে মৎস্যরূপ ধারণ করে বৈবস্বত মনুকে একটি নৌকার উপর রেখে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

১১) কূর্মরূপ ধারণ করে পৃষ্ঠে মন্দরাচল পর্বতকে ধারণ করেছিলেন।

১২) ধন্বন্তরিরূপে আবির্ভূত হন, মোহিনীরূপে আবির্ভূত হয়ে অসুরদের মোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছিলেন।

১৩) নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন।

১৪) বামনরূপে দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞস্থানে গমন করেছিলেন।

১৫) ভৃগুপতিরূপে অবতীর্ণ হয়ে ২১ বার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেছিলেন।

১৬) শ্রীব্যাসদেবরূপে অবতীর্ণ হয়ে বেদ বিভাজন করেছিলেন।

১৭) শ্রীরামচন্দ্র রূপে আবির্ভূত হয়ে রাবণকে বধ করেছিলেন।

১৮) শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম রূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন।

১৯) কলিযুগের প্রারম্ভে নাস্তিকদের সম্মোহিত করার জন্য বুদ্ধদেব নামে গয়া প্রদেশে অঞ্জনার পুত্ররূপে আবির্ভূত হন।

২০) তারপর দ্বাবিংশ অবতারে যুগ-সন্ধিকালে অর্থাৎ কলিযুগের অন্তে নৃপতিরা যখন দস্যুপ্রায় হয়ে যাবে, তখন ভগবান কল্কি অবতার নামে বিষ্ণুযশ নামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে অবতরণ করবেন।

পূর্বোল্লিখিত এই সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা কল্প অবতার। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। যখন নাস্তিকদের অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন আস্তিকদের রক্ষা করার জন্য ভগবান এই ধরা ধামে অবতীর্ণ হন।

এই বিশেষ শ্লোকটিতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্যান্য অবতারদের পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী।

যাঁরা তাদের বর্তমান জড় চক্ষু অথবা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানকে দর্শন করতে চান, তাঁদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে বিরাট রূপ নামক ভগবানের বাহ্যিক রূপের ধ্যান করতে।

যাঁরা দুরন্তবীর্য রথচক্রধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অনুকূলভাবে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা সেবাপরায়ণ, তাঁরাই কেবল জগতের সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ মহিমা, শক্তি এবং দিব্য ভাব সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের এবং ইতিহাসের নির্মল ও পূর্ণ বর্ণনা তাতে পরমেশ্বর ভগবানের কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময় বিগ্রহ এবং তাই তা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। আমরা যেভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করি, ঠিক সেইভাবেই আমাদের শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করা উচিত। তা যত্ন সহকারে এবং ধৈর্য সহকারে পাঠ করার ফলে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের পরম আশীর্বাদ লাভ করতে পারি।

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে জীবনের সার-সর্বস্ব, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তাই আমাদের অবশ্যই শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃতের কার্যাবলী

শ্রীমায়াপুরে বসন্ত পঞ্চমী উৎসব

শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে গত ১৬ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী তিথি পালিত হলো।

ব্রজলীলায় প্রকৃতি রাজ্যে নতুন পত্র পল্লব উদ্‌গম, আম্রমুকুল প্রকাশ, কোকিলের কুহুধ্বনি, মৃদুমন্দ দক্ষিণা সমীরণ সমন্বিত ঋতুরাজ বসন্তের আগমন সূচনা হয় এই শুক্লা পঞ্চমীতে। অর্থাৎ বলা হয় বসন্তকালের শুরু। তিন থেকে চার বছর বয়সী শ্রীকৃষ্ণ ও গোপকন্যাদের সাথে প্রথম মিলনকারিনী যোগমায়া পৌর্ণমাসীদেবী ব্রজে প্রচার করেছিলেন তোমাদের কন্যারা পরম সৌভাগ্যবতী হবে যদি তারা বসন্তের সূচনায় বসন্তরাজের পূজা করে এই মাঘীশুক্লা পঞ্চমী তিথিতে। গায়ে হলুদ মেখে স্নান শুচি হয়ে বাসন্তী রঙের বসন পরিধান করে বসন্তরাজের পূজার জন্য পূজার ডালি নিয়ে গোপকন্যারা বসন্তবটের কাছে উপস্থিত হয়ে বটমূলে বংশীবাদনরত কৃষ্ণকে দেখে বিমোহিত হয়। তাঁরা সেখানে কৃষ্ণকেই পূজা করে। এই গোপবালিকারা ছিলেন পূর্ব জীবনে সাধক-সাধিকা মুনি-ঋষি দেবী ও অপ্সরা, যারা শ্রীভগবানের দাসীত্ব প্রার্থনা করেছিলেন। তারাই ব্রজে গোপকুলের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করে এবং যোগমায়াদেবী তাদের এভাবে শ্রীহরির সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দেন।

এই দিন শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে বাসন্তী রঙের বসন, বাসন্তী রঙের নানা ফুলের গয়না, হলুদ মাখা অঙ্গ, রূপালী ও সাদা রঙের অলঙ্কারে মনোহর নব সাজে সজ্জিত শ্রীশ্রীরাধামাধব ও অষ্ট সখী, পঞ্চতত্ত্ব ও নৃসিংহদেব সবার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। অনেকেই এই দিন হলুদ বা বাসন্তী রঙের কাপড় পরিধান করে মন্দিরে আসেন।

ইসকন ভক্ত ৭৩ মিনিটে ভগবদ্‌গীতার ৭০০ শ্লোক মুখস্থ বলে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করলেন

ইসকন দৈব বর্ণাশ্রম মন্ত্রালয়ের ভক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস মাত্র ৭৩ মিনিটে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ৭০০ শ্লোক মুখস্থ বলে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করলেন।

রেকর্ডটি প্রকৃত পক্ষে ২৭শে জানুয়ারী ২০২০ সালে সন্ধ্যে ৫.১২ মিনিট থেকে ৬.২৫ মিনিট পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে বেলারী থেকে প্রাপ্ত হয় এবং এটি সেই সময় ইণ্ডিয়া বুক অব রেকর্ডে নথিভূক্ত হয়েছিল। অতি সম্প্রতিকালে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ সালে কৃষ্ণচন্দ্র দাস ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডস যুক্ত রাজ্য থেকে প্রশংসাপত্র গ্রহণ করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস পূর্বে একজন পেশাদারী চিকিৎসক ছিলেন কর্ণাটক রাজ্যের রাজধানী ব্যাঙ্গালোরে। ২০০৭ সালে ইসকন দৈব বর্ণাশ্রম মন্ত্রালয়ের সচিব ভক্তিরাঘব স্বামী তাঁকে দীক্ষা প্রদান করেন। তারপর তিনি কৃষক সম্প্রদায় বিকাশ সাধন শুরু করেন, গ্রামে গ্রামে প্রচার করেন, গোরক্ষা সচেতনতা, জৈব চাষ আবাদ ইত্যাদি করতে থাকেন। এই সমস্ত কার্যক্রম তাঁর ইসকন দৈব বর্ণাশ্রম মন্ত্রালয়ের অধীনে চলতে থাকে।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস শ্লোক মুখস্থ করার উৎসাহ তখন পান যখন দেখেন যে বৈদিক শাস্ত্র থেকে শ্লোক মুখস্থ তাঁর কৃষ্ণভাবনামৃত শিক্ষা প্রদানে এক অপরিসীম সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে।

তিনি বলেন, 'অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করে যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে গীতার সমস্ত ৭০০ শ্লোক বলা সম্ভব নয়,' তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে বলা পাঁচ হাজার বছর পূর্বে গীতার বাণী উল্লেখ করে বলেন যে আমি সেই সমস্ত মানুষকে বোঝাতে চেয়েছি যে এটি এত লম্বা সময় নেয়নি এবং কুরুক্ষেত্রে যা ঘটেছিল সেটি প্রমাণ করতে আমি সমস্ত ভগবদ্গীতা মাত্র ১ ঘণ্টা পনের মিনিটের কম সময়ে মুখস্থও বলেছি।

বিশ্ব খেতাব জয়লাভের পর কৃষ্ণচন্দ্র দাস জীবন পরিবর্তনকারী ভগবদ্গীতার পারমার্থিক জ্ঞান অপরের কাছে প্রচার করছেন। কোরলাগুণ্ডির ইসকন কেন্দ্রে ৭ থেকে ১৪ বছরের শিক্ষার্থীদের শ্লোক মুখস্থ রাখার জন্য স্থানীয় স্কুলে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং বর্তমানে তারা দুই, তিন অধ্যায় মুখস্থও বলছে। এছাড়াও কৃষ্ণচন্দ্র দাস প্রত্যেক রবিবার ভগবদ্গীতার পরম জ্ঞান বয়স্ক, স্থানীয় গ্রামবাসী, কৃষক সম্প্রদায় প্রভৃতি জনগণকে বিতরণ করছেন।

নব বৃন্দাবনে ছোট্ট রাধাবৃন্দাবন শ্রীবিগ্রহের ৫২তম অর্চন বর্ষ পালন

২৭শে ডিসেম্বর, ২০২০, প্রায় কুড়িজন নব বৃন্দাবন ভক্ত সুন্দর ছোট্ট রাধাবৃন্দাবন চন্দ্রের স্নান অভিষেক, জপ, প্রসাদম এবং এই শ্রীবিগ্রগণের বর্ণময় ইতিহাস বর্ণনা সহযোগে ৫২তম অর্চন বর্ষ পালন করলো।

মন্দির সভাপতি জয় কৃষ্ণ দাস বলেন, ''আমাদের বুঝতে হবে যে এটি সেই রাধাবৃন্দাবন চন্দ্র এবং এই ছোট্ট বিগ্রহই নব বৃন্দাবনের প্রথম রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ যা ১৯৭০ সালে প্রথম জন্মাষ্টমীতে ভক্তদের দ্বারা পূজিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ নির্দেশ দিয়েছিলেন কিভাবে তাদের পূজা করতে হবে এবং সেই নির্দেশ ভক্তদের কাছে অত্যন্ত উৎসাহ ব্যাঞ্জক ছিল। এই নির্দেশ সত্যি করেই শ্রীবিগ্রহ এবং ভক্তদের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।''

শতবর্ষ আবির্ভাব তিথি শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের নামে উৎসর্গ হলো

২০২১ সাল শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের শতবর্ষ আবির্ভাব বর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হলো। তিনি ছিলেন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রথম শিষ্য শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের শিষ্য। নারায়ণ মহারাজ সন্ন্যাসী হিসাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে ৫৮ বছর যাবৎ সেবা প্রদান করেন। যখন নারায়ণ মহারাজ এই পৃথিবী থেকে অপ্রকট হন তখন তিনি ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন এবং ভক্তিযোগের শিক্ষা প্রচার করেন।

নারায়ণ মহারাজ ইসকন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের সঙ্গে ১৯৪৭ সালে প্রথম সাক্ষাৎ করেন। ১৯৫৯ সালে শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত। পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের অনুরোধে শ্রীবৃন্দাবন ধামে নারায়ণ মহারাজ তাঁর সমাধি অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন।

নারায়ণ মহারাজের জন্ম শতবর্ষ উদ্যাপনের সম্মানে সমগ্র বিশ্বের তার ভক্তগণ এক উৎসবের আয়োজন করেন যেখানে হরিনাম সংকীর্তন হয় এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয়। একটি ৫৫ ঘণ্টা ব্যাপী মহিমা কীর্তনের অনুষ্ঠান সামাজিক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রচার করা হয় সেখানে তার ভক্তগণ এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা স্মরণিকা রাখেন। ইসকনের রাধানাথ মহারাজ তাঁর উদ্দেশ্যে প্রশংসা সূচক বক্তব্য পেশ করেন। হার্ডসটন সিটির মেয়র ১১ই ফেব্রুয়ারী ২০২১ দিনটিকে ''শ্রীমদ বি.ভি. নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ দিবস'' হিসাবে ঘোষণা করেন।

ইসকন সম্প্রচার মন্ত্রক অনুত্তম দাস বলেন, শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় বহুবছর ধরে নিয়োজিত থাকার জন্য এবং সমর্থন করার জন্য নারায়ণ মহারাজের কাছে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা এবং বিনম্র প্রণতি নিবেদন করছি।

মেটাপল্লী তেলেঙ্গানাতে রাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ স্থাপন

যখন থেকে মুম্বাই এবং সমগ্র ভারতবর্ষে লকডাউন লাগু হয়েছিল অধিকাংশ ভক্তই তখন দশমাসের অধিক সময় ধরে আশ্রমের বাইরে আসতে পারেনি। তাদের সমস্ত বাইরের অনুষ্ঠান এবং গ্রন্থ বিতরণ জুমের মাধ্যমে ভিডিও কলে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। যদিও এটি ছিল এক অসাধারণ সাফল্য আর ফল স্বরূপ অনেক রাস্তা খুলে গেছিল। কিন্তু তারা দারুণভাবে ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ হীনতা অনুভব করছিল এবং কৃষ্ণভাবনাময় উৎসবগুলি পালন করতে পারছিল না। এই আমন্ত্রণ পাবার পর তারা সকলেই প্রকৃতপক্ষে ভারচুয়াল ধারণা থেকে বাইরে এসে ভৌতিক জগতকে অনুভব করতে আগ্রহী ছিল।

মেটাপল্লী মুম্বাই থেকে প্রায় ৮০০ কিমি দূরত্বে তেলেঙ্গানার একটি ছোট্ট শহর। এটি মূলত কৃষি প্রধান শহর। এখানে ১০,০০০ লোকের বাস। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন নরহরি দাস চৌপাট্টি মন্দির থেকে প্রথম আসতে শুরু করেন তখন থেকে এই শহরে ইসকনের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। তিনি ছোট একটি তরুণদের দল সহযোগে এখানে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান শুরু করেন যা অতি শীঘ্রই স্থানীয় গ্রামবাসীদের আকৃষ্ট করে। তাদের মধ্যে অনেকেই কৃষ্ণভাবনামৃত অতি ঐকান্তিকতার সঙ্গে শুরু করেছেন এবং রোজ মালাতে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ শুরু করেন।

রবিবার উৎসবের অনুষ্ঠানগুলি শত শত ভক্তদের আকৃষ্ট করে এবং প্রসাদন বিতরণের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়। বার্ষিক রথযাত্রাগুলি বিপুল সাফল্য পায় এবং ফল স্বরূপ আশেপাশের গ্রামগুলিতে 'হরেকৃষ্ণ' এক নিত্য ব্যবহৃত শব্দে পরিণত হয়। আশানুরূপ ভাবে সেখানে একটি মন্দির নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয় যাতে করে অনেক ভক্ত সেখানে সমবেত হতে পারে এবং ভগবানের দিব্য নাম জপে অংশগ্রহণ করতে পারে।

অবশেষে, ১৬ই ফেব্রুয়ারী বসন্ত পঞ্চমীর দিন মহা আড়ম্বরে এখানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করা হয় এবং প্রায় একহাজার ভক্ত এতে অংশগ্রহণ করেন। অর্চা বিগ্রহের আগমনে অনেক ভক্ত মন্দিরে ভীড় করবে, অনেকে সেবা করার সুযোগ অন্বেষণ করবে। এইটি কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে বিকশিত করবে।

নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী শ্রীল প্রভুপাদের ১২৫তম শুভ আবির্ভাব বর্ষ পালনের সরকারী সূচনা

২০২১ সালটি, ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের ১২৫তম শুভ আবির্ভাব বর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অম্বরীশ দাস এবং বৈদিক তারা মণ্ডল মন্দির (TOVP) পরিচালকবর্গ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ২৫শে ফেব্রুয়ারী নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী উৎসব পালনের দিনটি থেকে এই অনুষ্ঠানের সরকারীভাবে সূচনা করা হবে এবং পাশাপাশি ''প্রভুপাদ আসছেন!'' এই মুখ্য বিষয়টির প্রচার এবং ঘোষণা করা হবে যে এই বছর অক্টোবর মাসে TOVPতে শ্রীল প্রভুপাদের নতুন মূর্তি স্থাপন করা হবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরম্পরাতে ভগবান বলরাম যেহেতু নিজেই নিত্যানন্দ তাই তিনি আদিগুরু। আধ্যাত্মিক গুরু হলেন নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধি এবং এই রূপে নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিতে ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের ১২৫তম শুভ আবির্ভাব বর্ষ পালন এবং তার মহিমা কীর্তন করা উপযুক্ত সময়।

উৎসবের সূচনা হবে TOVPতে বিজয় পতাকা উত্তোলন দিয়ে এবং শ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কীর্তন দিয়ে। এছাড়াও থাকবে অন্যান্যদের বক্তৃতা এবং কীর্তন। অন্যান্য উৎসবে অনুষ্ঠান সমূহ মায়াপুর ইসকন চত্বরে সমস্ত দিন ব্যাপী চলতে থাকবে।

এই অনুষ্ঠানটির সাথে সাথে অক্টোবর মাসে শ্রীল প্রভুপাদের মূর্তি স্থাপনের মহা উৎসব, ''প্রভুপাদ আসছেন!'' এই প্রচারের সরকারী সূচনা এবং জীবিতকালে মাত্র একবার পাঁচ অভিষেকের এক অভিষেক করার সুযোগ গ্রহণেরও সূচনা করা হবে। লোকনাথ স্বামী এই ১২৫তম আবির্ভাব বর্ষকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে অভিষেকের জন্য ১২৫টি পবিত্র নদীর জল সংগ্রহের ব্যবস্থা করছেন।

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৩৯।।

রামাদি মূর্তিষু—রামচন্দ্র প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে; *কলা-নিয়মেন*—স্বাংশ কলাদিরূপে; *তিষ্ঠন*—অবস্থান করে; *নানা - অবতারম্*—বিভিন্ন অবতার; *অকরোৎ*—প্রকাশ করে থাকেন; *ভুবনেষু*—জগতে; *কিন্তু*—পরন্তু; *কৃষ্ণঃ স্বয়ং*—নিজেই কৃষ্ণরূপে; *সমভবৎ* — অবতীর্ণ হন; *পরমঃ পুমান্*—পরম পুরুষ; *যঃ*—যিনি; *গোবিন্দম্*—গোবিন্দকে; *আদিপুরুষম্* — আদিপুরুষ; *তম্*---তাঁকে; *অহম্*---আমি; *ভজামি*—ভজন করি।

যে পরমপুরুষ স্বাংশকলাদি নিয়মে রামাদি মূর্তিতে স্থিত হয়ে জগতে নানা অবতার প্রকাশ করেছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হয়েছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ — পরমেশ্বর আদিপুরুষ গোবিন্দ থেকে স্বাংশ ও অংশের অংশ রূপে রাম প্রভৃতি অবতার চিন্ময় জগতে রয়েছেন।

নানা-অবতারম্-অকরোদ্-ভুবনেষু—চিন্ময় জগত থেকে জড় জগতে সেই সমস্ত নানাবিধ অবতার অবতীর্ণ বা প্রকাশিত হন।

কিন্তু কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্—পরন্তু স্বয়ং রূপ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অবতীর্ণ হন (ক্ষেত্র বিশেষে)।

স্বাংশ অবতার রূপে রামচন্দ্র প্রভৃতি অসংখ্য অবতার বৈকুণ্ঠ থেকে জড় জগতে অবতীর্ণ হন। আর, কৃষ্ণ গোলোকের ব্রজধামসহ স্বয়ং এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন, পরমপুরুষ কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণচৈতন্যও সেই স্বয়ং রূপেই এই জগতে প্রকটিত হয়েছেন—এটাই গূঢ় তাৎপর্য।

গোবিন্দম্ আদিপুরুষম্ তম্ অহম্ ভজামি—সেই সর্ব অবতারের অবতারী আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি।

শ্রীল রূপ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন, অবতারাবলীবীজমবতারী নিগদ্যতে। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।২০৩)। অবতারীকেই সমস্ত অবতারের বীজ বা কারণ বলা হয়। যেমন, গীতগোবিন্দ গ্রন্থে—যিনি মৎস্য রূপে বেদসমূহ উদ্ধার, কূর্ম রূপে পৃষ্ঠে পৃথিবীকে ধারণ, বরাহ রূপে দন্তোপরি ভূগোল ধারণ, নৃসিংহ রূপে হিরণ্যকশিপুর বক্ষোবিদারণ, বামন রূপে বলিকে ছলনা, পরশুরাম রূপে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস, রাম রূপে রাবণ বিনাশ, বলরাম রূপে হলগ্রহণ, বুদ্ধ রূপে কারুণ্য বিস্তার এবং কল্কি রূপে ম্লেচ্ছ সংহার করে থাকেন—দশবিধ রূপ হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমায় প্রণাম জানাই।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য অবতার। অবতারাঃ হি অসংখ্যেয়াঃ হরেঃ। (ভাগবত ১।৩।২৬)

এই সমস্ত অবতারেরা ভগবানের পুরুষাবতারদের অংশ বা কলা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ (ভাগবত ১।৩।২৮)।

মূর্তিপূজা বনাম বিগ্রহসেবা

প্রেমাঞ্জন দাস

নাস্তিকেরা সাধারণত যুক্তি দেখায় যে আপনারা কৃষ্ণের মূর্তিকে স্বয়ং ভগবান রূপে পূজা করেন, কিন্তু—

১) মূর্তি তৈরি করেন একজন শিল্পী। তাহলে শিল্পী হলেন ভগবানের স্রষ্টা। তাহলে ভগবান কি করে স্রষ্টা হবেন?

২) সেই মূর্তি অনেক সময় নানা ভাবে ভেঙ্গে যায়। তার মানে ভগবান নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না। তাহলে তিনি কি করে সর্বশক্তিমান হলেন?

৩) মূর্তি এক সীমিত বস্তু। সীমিত বস্তু কি করে অসীম ভগবান হতে পারেন?

৪) বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম রূপের কল্পনা করেন। কেউ যদি একটি কলাগাছকে ভগবান বলে মনে করেন, তাহলে তা কি ভগবান হয়ে যাবে?

৫) বেদে মূর্তি পূজা সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই।

৬) ভগবান নিরাকার। আর মূর্তি হলো সাকার। নিরাকারের সাকার উপাসনা কি করে সম্ভব? ইত্যাদি বহু রকমের যুক্তি তারা দিয়ে থাকেন যার কোন শেষ নেই। আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে প্রধানত উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর ঃ মনে করুন যে একজন শিল্পী অষ্টধাতু দিয়ে একটি মূর্তি তৈরি করলেন। সেই অষ্টধাতুর স্রষ্টা কে? নিশ্চয়ই সেই শিল্পী অষ্টধাতুর স্রষ্টা নয়। অষ্টধাতু হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টি। আবার সেই শিল্পীকে কে সৃষ্টি করেছেন? সেই শিল্পীকেও সৃষ্টি করেছেন ভগবান। সেই শিল্পীর হাতে যদি পারালাইসিস তথা পক্ষাঘাত থাকে, তাহলে শিল্পী মূর্তি তৈরি করতে পারবেন না। তাহলে শিল্পীর সৃষ্টি শক্তিও ভগবানের দান। অর্থাৎ মূর্তির সৃষ্টিকার্য মূলত ভগবানের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই কোন শিল্পীই স্রষ্টার স্রষ্টা নন।

রাষ্ট্রপতি ভবনের স্রষ্টা বহু সংখ্যক মিস্ত্রি হতে পারে, কিন্তু সেখানে রাষ্ট্রপতি বাস করেন। ঠিক তেমনি শিল্পী মূর্তি তৈরি করেন এবং ভক্তের আহ্বানে ভগবান সেই মূর্তির মধ্যে বাস করেন। মূর্তি তখন চিন্ময় বিগ্রহ রূপে প্রকাশিত হন।

লোহার মধ্যে আগুন প্রবেশ করলে লোহাও অগ্নিময় হয়ে উঠে। ঠিক তেমনি বিগ্রহ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা চিন্ময় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ভক্তি সহকারে যখন ভগবানকে আহবান করা হয়, ভগবান তখন সেই বিগ্রহের মধ্যে আবির্ভূত হন।

শ্রীল প্রভুপাদ পোস্ট বক্সের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ভারতবর্ষে সরকারী ডাকঘরের সামনে টিনের তৈরি লাল রঙের পোস্ট বক্স থাকে। সেটি সরকার দ্বারা অনুমোদিত বলে সেখানে চিঠি ফেললে তা যে কোন দেশে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে যাবে। তবে কোন কর্মকার যদি একই ধরনের বাক্স তৈরি করেন যা সরকার দ্বারা অনুমোদিত নয়, তাহলে তাতে চিঠি ফেললে তা কিন্তু ওইখানেই পড়ে থাকবে। ঠিক

তেমনি কোন মন্দিরে যখন সদ্ গুরু দ্বারা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়, তা সরকার অনুমোদিত পোস্ট বক্সের মতো আমাদের হৃদয়ের চিঠি কৃষ্ণের কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ঃ মূর্তি ভেঙ্গে যায়। মূর্তি কেন নিজেকে রক্ষা করেন না? ভগবান যদি সর্বশক্তিমান হয় তো তিনি নিজেকেও রক্ষা করতে পারবেন। কোরান, বাইবেল, গীতা ইত্যাদি গ্রন্থ হচ্ছে ভগবানের সম্পত্তি। কিন্তু নাস্তিকেরা এসব গ্রন্থ আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। ভগবান কি তার সম্পত্তিকে রক্ষা করতে অক্ষম? নাস্তিকেরা প্রশ্ন করে, ঠিক আছে, ভগবান তার সম্পত্তি রক্ষা করছেন না, কিন্তু মূর্তি তো স্বয়ং ভগবান। ভগবান কেন ভগবানকে রক্ষা করতে পারছেন না? তার উত্তর হলো, মূর্তি দুই প্রকার ঃ মূর্তি ও বিগ্রহ। যেমন বিদ্যুতের তার দুই প্রকার।

কোন কোনও বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎ শক্তি প্রবাহিত হয়। আবার কোন কোনও তারে বিদ্যুৎ থাকে না। বিদ্যুৎ প্রবাহিত তার স্পর্শ করলে যে কোনও মানুষের মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু বিদ্যুৎ বিহীন তারে স্পর্শ হলে কিছুই হবে না। ঠিক তেমনি, যে বিগ্রহে ভক্তের নিরপরাধ ভক্তি বিদ্যুৎ প্রবাহিত আছে, তাকে মূর্তি বলে না, তাকে বলা হয় বিগ্রহ। সেই বিগ্রহ ভক্তের সঙ্গে কথা বলে। তাকে কেউ ভাঙতে পারে না। অন্যপক্ষে, যে মূর্তিতে নিরপরাধ ভক্তি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না, তা সাধারণ জড়বস্তু। তাই সেটিতে জড়ের ধর্ম প্রকাশিত হবে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর ঃ মূর্তি সীমিত। অসীম ভগবান কি করে সেই সীমিত। সীমিত বিগ্রহের সীমার বন্ধনে আবদ্ধ হন? এর উত্তর হলো যে, কৃষ্ণ সর্ব শক্তিমান। রাস নাচের সময় এক সীমিত কৃষ্ণ থেকে লক্ষ লক্ষ প্রকাশিত হলেন। মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্র মুখের মধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তথা গ্রহ নক্ষত্র দর্শন করেছিলেন। এভাবে ভগবান হলেন সীমার মাঝে অসীম। তাই সর্ব শক্তিমান ভগবান সীমিত বিগ্রহের মধ্যেও তার অসীম স্বরূপ এবং শক্তি প্রকাশ করতে সক্ষম। এবং শুদ্ধ প্রেমিক ভক্তের মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি তা করে থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, পশু হত্যাকারীরা এবং আত্ম হননকারী পাপীরা এই রহস্য বুঝতে পারবে না।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর ঃ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম রূপের কল্পনা করেন। কেউ যদি একটি কলাগাছকে ভগবান বলে মনে করেন, তাহলে তা কি ভগবান হয়ে যাবে? উত্তর হল, না। যেকোনো কাল্পনিক রূপ বিগ্রহ হয় না। বিগ্রহের বর্ণনা শাস্ত্রে রয়েছে এবং সেই বর্ণনা মেনে শিল্পীকে বিগ্রহ নির্মাণ করতে হয় এবং পুনরায় সদ্ গুরুদেব সেই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিটি পদক্ষেপ শাস্ত্র মেনে করা হচ্ছে। এখানে কল্পনার কোন স্থান নেই।

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর ঃ বৈদিক শাস্ত্রে বিগ্রহ পূজার কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু এই যুক্তিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বহু বৈদিক গ্রন্থে বিগ্রহ পূজার উল্লেখ আছে। বিশেষ করে গোপাল তাপনী উপনিষদে (দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক ৯৫ এবং ৯৬) তিন প্রকার বিগ্রহের উল্লেখ আছে। এমন কি বৈদিক কল্পবৃক্ষের সুপক্ক ফল অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতেও ৮ প্রকার বিগ্রহের উল্লেখ আছে (১১/২৭/১২)ঃ

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা।।

এছাড়া পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে যারা বিগ্রহকে পাথর বলে মনে করে তারা নরকের যাত্রী। (বৈষ্ণব শ্লোকাবলী, পৃষ্ঠা ২০১)

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর ঃ ভগবান নিরাকার। আর মূর্তি হলো সাকার। নিরাকারের সাকার উপাসনা কি করে সম্ভব? গোপাল তাপনী উপনিষদের অধিকাংশ শ্লোকে ভগবানের রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান হচ্ছেন সবচেয়ে সুন্দর। তার নাম হচ্ছে অনন্ত রূপ। অর্থাৎ তার রূপের কোন অভাব নেই। শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য বহু পুরাণে ভগবানের রূপের বর্ণনা রয়েছে। নিরাকারবাদীরা শূন্যের ধ্যান করে। শূন্যই তাদের কাছে ভগবান। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানকে প্রেমময় বলা হচ্ছে। প্রেম কখনও শূন্যের সঙ্গে হয় না। ভগবান হচ্ছেন শ্যামসুন্দর, মুরলীধর। অনন্ত রূপের সাগর।

শ্রীরামের বনগমন

শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতা তিনজনে গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে পিতা-মাতাদের প্রণাম নিবেদন করলেন। রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে তাঁরা গুরুদেব বশিষ্ঠের গৃহের সামনে এলেন। গুরু প্রণতি জানিয়ে সমাগত শোকাচ্ছন্ন প্রজাদের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র করজোড়ে বললেন, সেই আমার যথার্থ হিতৈষী, যে মহারাজকে সুখী করতে সক্ষম হবে। হে সুচতুর প্রবীণ প্রজাগণ, আপনারা ব্যবস্থা করবেন যেন আমার মাতাগণ বিরহ দুঃখে দীনহীন না হয়ে পড়েন। বহু দাসদাসী কান্না করছিল। তাদেরকে দেখিয়ে রামচন্দ্র বললেন, গুরুদেব, আপনি মাতা-পিতার মতো এদের সবাইকে সুখে রাখবেন।

রাজা দশরথ মূর্ছিত ছিলেন। মূর্ছা ভঙ্গ হলে, মনে মনে বললেন, ও আমি এখনও বেঁচে আছি, আমার প্রাণ চলে যাচ্ছে। এ আমায় মরণের চেয়েও অধিক কিছু হচ্ছে। তারপর সামনে মন্ত্রী সুমন্ত্রকে দেখলেন। হে সুমন্ত্র! তুমি যাও রথে করে ওদেরকে ঘুরিয়ে দুই চারদিন বনবিহার করে ওদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে আসো। হায় বিধি বাম। আমার কথার কোনো দাম নেই। রাম লক্ষ্মণ সীতাকে আমার কাছে এনে দাও। এই বলে রাজা আবার মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কৌশল্যা ও সুমিত্রা তাঁকে সুস্থ করার চেষ্টা করলেন।

সুমন্ত্র বহু অনুনয় করলে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা রথে উঠলেন। অযোধ্যাকে মনে মনে প্রণতি নিবেদন করলেন। প্রচুর লোকের ভীড় হলো। অযোধ্যাবাসী প্রজাবৃন্দ ভীড়ের মাঝে একে অন্যদের বলতে লাগল, রামচন্দ্র যেখানে যাবে আমরাও সেখানে যাব। রামচন্দ্র যদি অযোধ্যা ছেড়ে চলে যায়, আমরাও অযোধ্যা ছেড়ে চলে যাব। শ্রীরামচন্দ্র বারবার বোঝাতে লাগলেন আমি সময় মতো ফিরে আসবো, তোমরা আমার সঙ্গে এসো না। ক্রন্দন করতে করতে প্রজারা বলতে লাগল, আমরাও আপনার সঙ্গে যাব, আপনার সঙ্গে ফিরে আসবো। সত্যি সত্যি প্রজাবৃন্দ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল শোভাযাত্রা করতে লাগল। যেতে যেতে অযোধ্যা রাজ্যের সীমানা অবধি তাঁরা এসে পৌঁছলেন। সূর্যাস্ত হলো। অন্ধকার নেমে এলো। তমসা নদীর তীরে সবাই বিশ্রাম নিলেন।

রামচন্দ্র চিন্তা করলেন, কিভাবে প্রজারা আমাদের সঙ্গে না গিয়ে ঘরে ফিয়ে যাবে। নিদ্রা দেবী সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। তখন দুপুর রাত। রামচন্দ্র সীতা লক্ষ্মণ

মহাদেবকে প্রণাম জানিয়ে রথে চড়লেন, খুব সাবধানে সুমন্ত্র রথ চালালেন যাতে কোনও রকম টের না পায় লোকে। কিছুক্ষণ পর অযোধ্যাবাসীরা জেগে উঠে দেখল, রামচন্দ্র চলে গেছেন। রথ কোন্ দিকে গেল কিছুই বোঝা গেল না। দলে দলে এদিক সেদিক দৌড় ঝাঁপ করতে লাগল শেষ রাতের দিকে। কিছুই লাভ হলো না। নাই কোন তার নিশানা। ব্যথাতুর চিত্তে প্রজারা অযোধ্যায় ফিরে এলো। তারা সবাই মিলে এক জায়গায় হয়ে একটি সিদ্ধান্ত নিল। আমরা যেহেতু রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে কিংবা তাঁর সাথে থাকতে ব্যর্থ হয়েছি, তাই আমরা সবাই তাঁকে আবার দর্শন করবার জন্যে চৌদ্দ বছর হোক কিংবা যত বছর হোক, আমাদের জীবনে নিয়ম ব্রত পালন করে চলবো। আমরা শুদ্ধ, প্রীতিপূর্ণ ও নিয়মনিষ্ঠাপূর্ণ জীবন যাপন করব।

আসবে আবার মোদের মাঝে
সেই আশাতে রই।
জীবন সেদিন ধন্য হবে
তোমায় যেদিন পাই।।

এদিকে রামচন্দ্র পৌঁছলেন শৃঙ্গবেরপুর। গঙ্গানদী দর্শন করে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, সুমন্ত্র সবাই গঙ্গাদেবীকে প্রণাম জানালেন। স্নান করলেন, গঙ্গাজল পান করলেন। এটি নিষাদরাজ গুহকের রাজ্য। রামচন্দ্রের আগমন জানতে পেরে গুহক এসে দণ্ডবৎ প্রণতি জানিয়ে রামচন্দ্রকে তার নগরে আসতে বললেন। রামচন্দ্র বললেন, হে সখা, তোমার আমন্ত্রণ একান্তই আন্তরিক, কিন্তু আমার উপর পিতৃনির্দেশ আছে মুনির বেশ, মুনির ব্রত, মুনির আহার করে বনেই চৌদ্দ বছর অবস্থান করতে হবে। তাই তোমার নগরে যাওয়া আমার পক্ষে ঠিক না।

গুহক একটি অশোকবৃক্ষতলে তৃণ ও পাতা বিছিয়ে তাঁদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁদের ভোজনের জন্য নানাবিধ ফলমূল সংগ্রহ করে আনলেন। রামচন্দ্র বিশ্রাম করলে লক্ষ্মণ তাঁর পদসেবা করতে লাগলেন। রামচন্দ্র নিদ্রা গ্রহণ করেছেন জেনে লক্ষ্মণ উঠে গিয়ে মন্ত্রী সুমন্ত্রকে শয়ন করতে অনুরোধ করলেন এবং নিজে তীর-ধনুক নিয়ে জেগে থেকে প্রহরা দিতে লাগলেন। গুহকরাজও স্থানে স্থানে কিছু বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে প্রহরা কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। নিজেও ধনুর্বাণ নিয়ে লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে বসেছিলেন।

সেই সময় নিষাদরাজ লক্ষ্মণের কাছে, কেন এভাবে বনগমন হচ্ছে, ব্যাপারটা ভালো করে জানতে ইচ্ছা করলেন। সবকিছু শুনে দুঃখিত অন্তরে গুহক বললেন, সূর্যবংশ একটি সুন্দর বৃক্ষ। আর মন্দমতি কৈকেয়ী একটি কুড়ুল। বৃক্ষছেদন করে সবাইকে দুঃখ দিল। এই সীতাদেবী রামচন্দ্র যাঁরা রাজভবনে এতদিন বহু দাসদাসী সেবিত হয়ে, মাতাপিতার স্নেহে লালিত হয়ে সুকোমল সুন্দর শয্যায় শয়ন করতেন, তাঁরা আজ বিনা চাদরে, বিনা বিছানায় মাটিতে শুয়ে আছেন।

লক্ষ্মণ তখন মধুর বচনে উত্তর দিলেন, হে ভাই! তুমি জানবে যে, কেউ কাউকে সুখ দিতে পারে না, দুঃখ

দিতে পারে না। সবাই তো নিজের কর্মফল ভোগ করে থাকে। সংসারে যে সব ঘটনা দেখো—সংযোগ কিংবা বিয়োগ, উত্তম ভোগ কিংবা অধম ভোগ, শত্রু-মিত্র বা উদাসীন---এ সবই স্বপ্নের মতো। জন্ম-মৃত্যু, সম্পত্তি-বিপত্তি, কর্ম ও কাল—যতদূর পর্যন্ত জাগতিক প্রপঞ্চ রয়েছে এবং ভূমি, গৃহ, ধনসম্পদ, নগর, পরিবার, স্বর্গ-নরক, যা কিছু আচার-ব্যবহার এবং যা কিছুর দর্শন, শ্রবণ, চিন্তন করা হয়, তার মূলে থাকে মোহ বা অজ্ঞান। পরমার্থ চিন্তায় এই সবকিছুর অস্তিত্ব নেই। যেমন স্বপ্নের মধ্যে রাজা কাঙ্গাল হয়ে গেল, কিংবা কাঙ্গাল ইন্দ্রপদ পেয়ে গেল। কিন্তু জেগে উঠলেই সে সবই অসত্য বলে জানা যায়। স্বপ্ন দেখে কারও লাভ বা ক্ষতি নেই, তেমনই এই জগৎ প্রপঞ্চকেও স্বপ্ন বলে মনে করো।

লক্ষ্মণ বললেন—ক্রোধ করাও ঠিক নয়, কাউকে দোষী সাব্যস্ত করাও অনুচিত। মোহ রাত্রিতে সবাই ঘুমিয়ে নানারকম স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু যোগীরা সেই মোহ রাত্রিতে জেগে থাকেন পরমার্থ চিন্তাতে। তাঁরা মায়ামোহময় জগত সম্বন্ধে উদাসীন। জগতে জীবকে তখনই জাগ্রত মনে করবে যখন তার অন্তর থেকে সব রকমের ভোগবাসনা দূর হয়। বিবেক জেগে উঠলে মোহভ্রান্তি পালিয়ে যায়। তখন জীবের শ্রীরামচরণে প্রীতি হয়। হে সখা! সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ হলো কায়মনোবাক্যে রামচন্দ্রের চরণে প্রেম ধারণ করা। তিনিই পরমব্রহ্ম। তিনি ভক্ত, ভূমি, গো, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের মঙ্গলের জন্য নরদেহ ধারণ করে থাকেন। লীলা করে থাকেন। সেই লীলা কথা শ্রবণ করলে জীবের ভববন্ধন মোচন হয়। হে সখা! তাই মোহ ছাড়ো। সীতারামের চরণে প্রীতি ধারণ করো।

মোহ রাত্রিতে সবাই ঘুমিয়ে নানারকম স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু যোগীরা সেই মোহ রাত্রিতে জেগে থাকেন পরমার্থ চিন্তাতে। তাঁরা মায়ামোহময় জগত সম্বন্ধে উদাসীন। জগতে জীবকে তখনই জাগ্রত মনে করবে যখন তার অন্তর থেকে সব রকমের ভোগবাসনা দূর হয়।

সারা রাত এই সব তত্ত্বকথা শুনতে শুনতে সেই রাত্রি অতিবাহিত হলো। এক নতুন প্রেরণা পেয়ে জেগে উঠল গুহক রাজার হৃদয়।

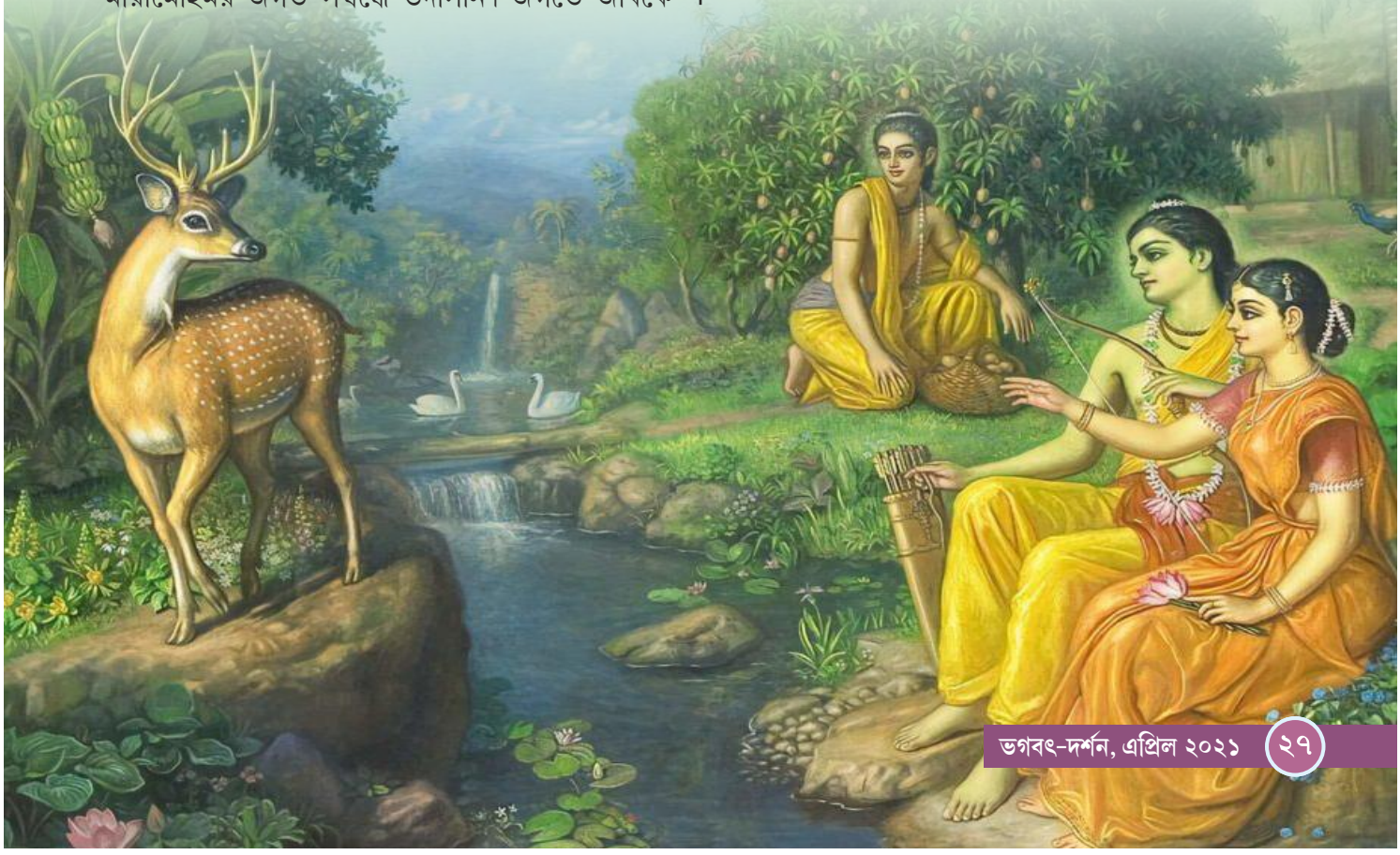

ভাঙ্গা খাটের বৈরাগ্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষামূলক গল্প হতে সংগৃহীত

তাৎপর্যঃ

প্রকৃত বৈরাগ্য এটি নয় যে, যখন খাট ভেঙে গেল তখন কেউ মাটিতে নিদ্রা যাচ্ছে। আসলে এটি একজনের অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা শুধুমাত্র যশ প্রতিষ্ঠা অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন কোন মায়াবাদী বা নিরাকারবাদী এই জড় জগতে বৈরাগ্য দেখায় তখন হয় সে ক্রোধ প্রকাশ করে বা আপাত বৈরাগ্যের বস্তুর প্রতি গভীর আসক্তি দেখায়। সে এই সমস্ত বস্তুর নিরন্তর ভোগ করতেই থাকে যেটি তাকে পূর্বে কোন সমস্যা দেয়নি। শুদ্ধ ভক্ত কখনো এই ভাবে তার বৈরাগ্য প্রদর্শন করে না। তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করে। তারা জানে যে ভগবান হচ্ছেন পরম ভোক্তা এবং কোন জীবাত্মার নিজের কোন ভোগ বাঞ্ছা থাকা উচিত নয়। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই ভগবৎ প্রসাদকে তাঁর অপরিসীম কৃপা বলে গ্রহণ করে, সে কখনো অসুখী বা কোন বস্তুর প্রতি আসক্ত হয় না।

বিন্ধ্যাবলীর ভগবৎ বন্দনা

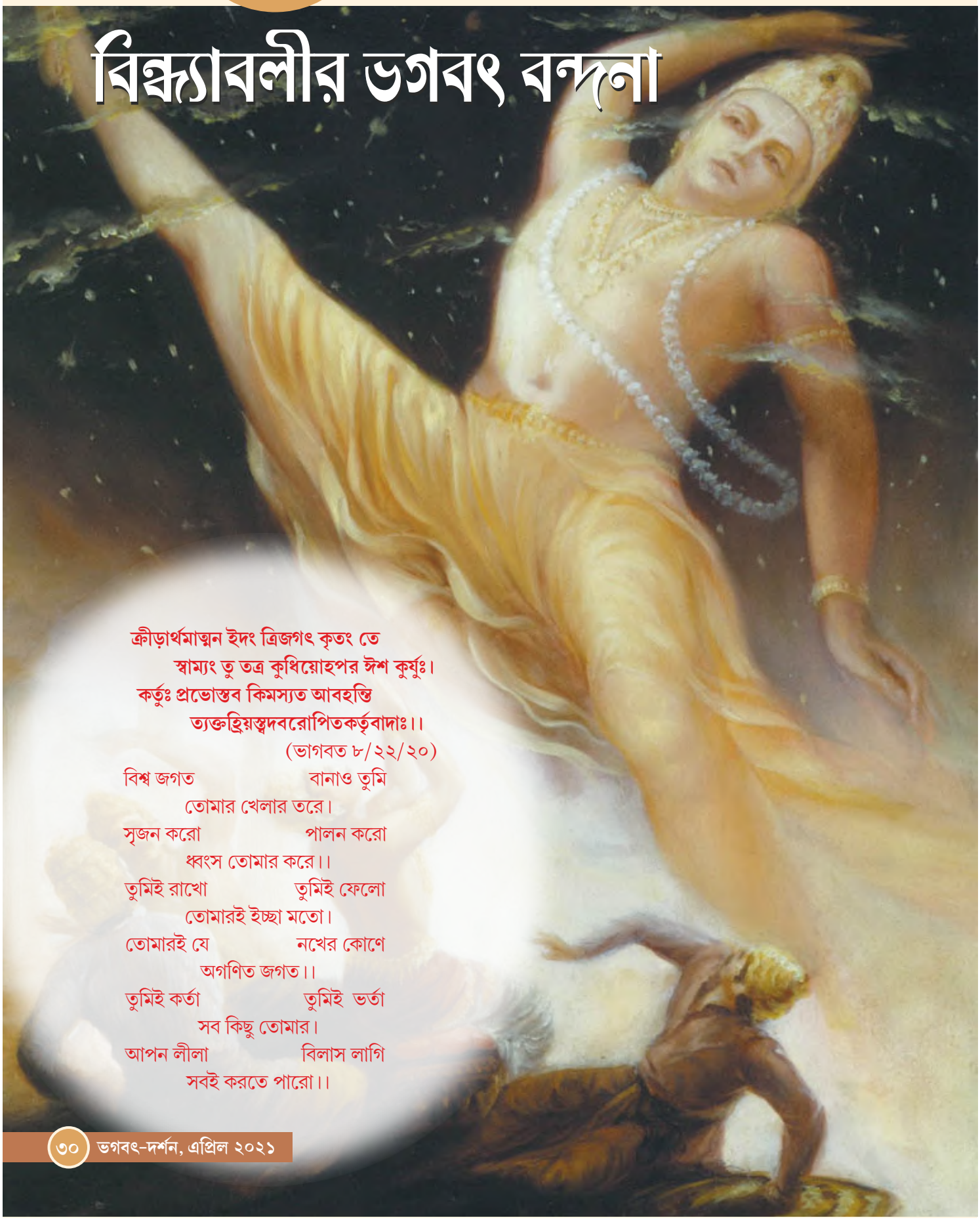

ক্রীড়ার্থমাত্মন ইদং ত্রিজগৎ কৃতং তে
স্বাম্যং তু তত্র কুধিয়োঽপর ঈশ কুর্যুঃ।
কর্তুঃ প্রভোস্তব কিমস্যত আবহন্তি
ত্যক্তহ্রিয়স্ত্বদবরোপিতকর্তৃবাদাঃ।।
(ভাগবত ৮/২২/২০)

বিশ্ব জগত বানাও তুমি
তোমার খেলার তরে।
সৃজন করো পালন করো
ধ্বংস তোমার করে।।
তুমিই রাখো তুমিই ফেলো
তোমারই ইচ্ছা মতো।
তোমারই যে নখের কোণে
অগণিত জগত।।
তুমিই কর্তা তুমিই ভর্তা
সব কিছু তোমার।
আপন লীলা বিলাস লাগি
সবই করতে পারো।।

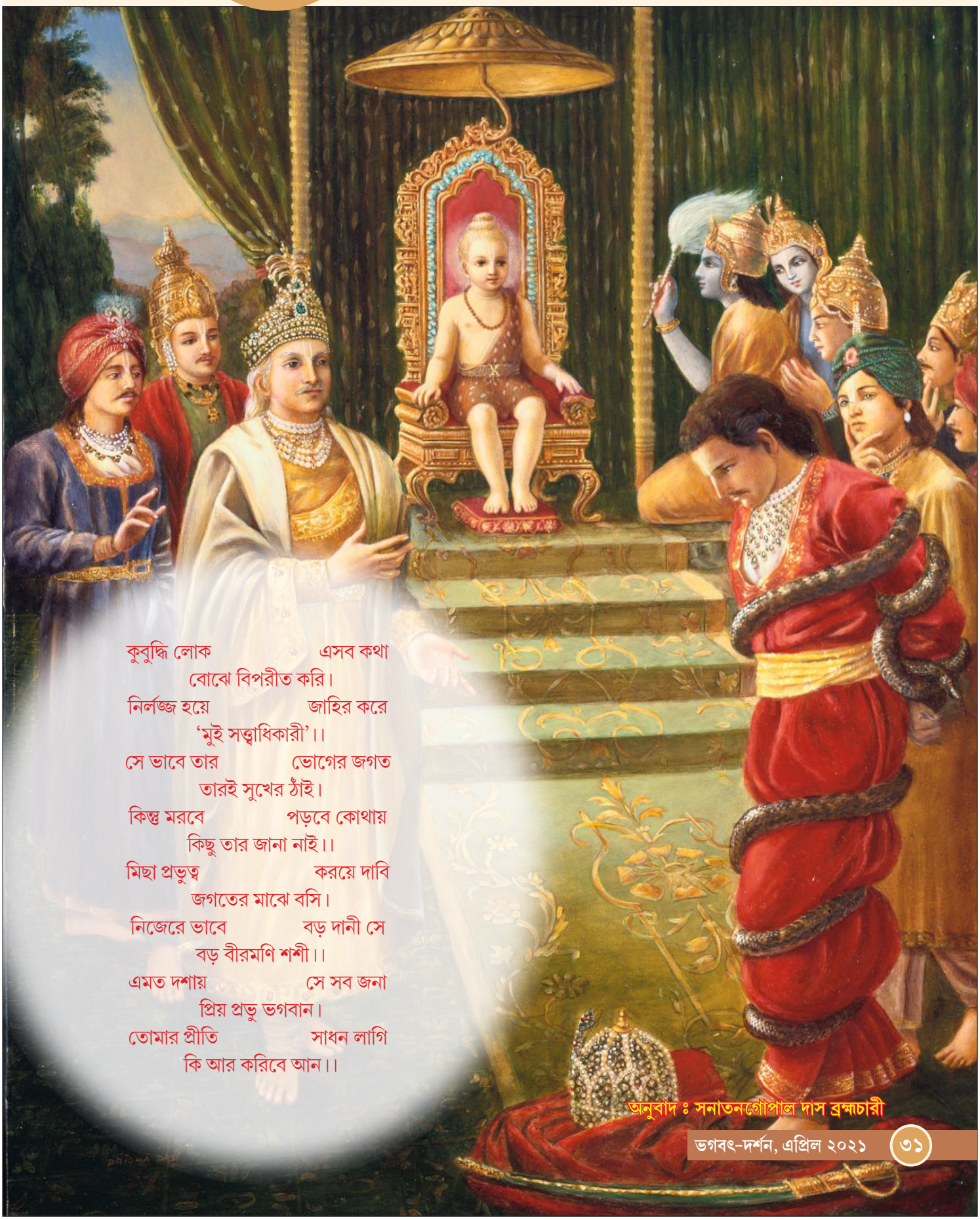

কুবুদ্ধি লোক এসব কথা
বোঝে বিপরীত করি।
নির্লজ্জ হয়ে জাহির করে
'মুই সত্ত্বাধিকারী'।।
সে ভাবে তার ভোগের জগত
তারই সুখের ঠাঁই।
কিন্তু মরবে পড়বে কোথায়
কিছু তার জানা নাই।।
মিছা প্রভুত্ব করয়ে দাবি
জগতের মাঝে বসি।
নিজেরে ভাবে বড় দানী সে
বড় বীরমণি শশী।।
এমত দশায় সে সব জনা
প্রিয় প্রভু ভগবান।
তোমার প্রীতি সাধন লাগি
কি আর করিবে আন।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

প্রকাশিত হয়েছে

কয়েক হাজার নিদারুণ প্রশ্ন এবং সহজ সুন্দর উত্তর সম্বলিত অত্যন্ত আকর্ষণীয় গ্রন্থ

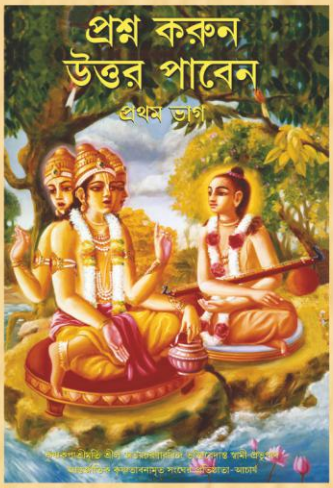

প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন

(প্রথম ভাগ)

তাকালেই পেতে চাইবেন

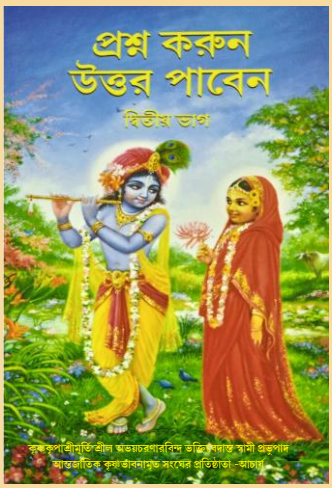

প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন

(দ্বিতীয় ভাগ)

এই দুটি গ্রন্থে রয়েছে আপনার সত্য জিজ্ঞাসু মনের মণিকোঠায় জেগে ওঠা হরেক প্রশ্নের সমাধান!

আজই সংগ্রহ করুন

* এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন আপনার নিকটবর্তী ইসকন কেন্দ্র কিংবা সংকীর্তন প্রচার বাসগুলোতে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ৭৪১৩১৩